শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প

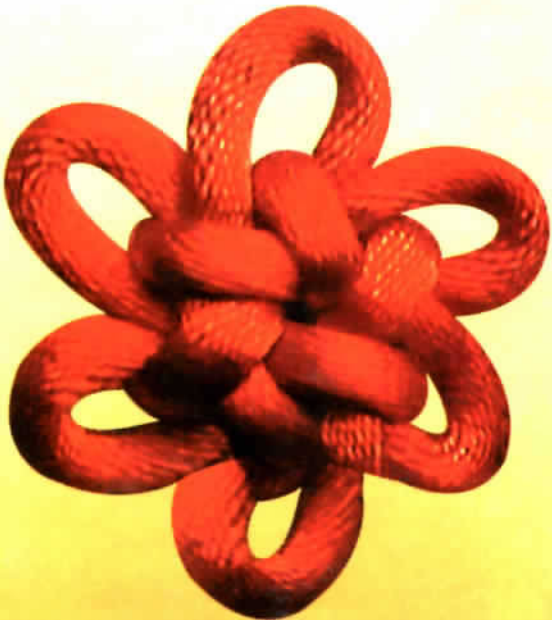

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প

সম্পাদনা
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৮৬

গ্রন্থমালগ্না সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪১৮ জানুয়ারি ২০১২

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0285-6

সূচি

ও হেনরি ॥ পুলিশ ও উপাসনাগীতি	৭
কৃষণ চন্দর ॥ জঞ্জাল-বুড়ো	১৩
জ্যাক লন্ডন ॥ এক টুকরো মাংস	২৩
অস্কার ওয়াইল্ড ॥ নাইটিংগেল ও একটি লাল গোলাপ	৪২
ম্যাক্সিম গোর্কি ॥ মাকার চুদ্রা	৪৮
গী দ্য মোপাসাঁ ॥ নেকলেস	৬১
রিউনোসুকে আকুতাগাওয়া ॥ নরকচিত্র	৭০

ও হেনরি

পুলিশ ও উপাসনাগীতি

ম্যাডিসন স্কোয়ারে তার বেঞ্চিটার উপর সোপি অস্বস্তিতে নড়ে উঠল। যখন বুনো হাঁস রাত্রে আকাশে ওড়ে, যখন সিল মাছের চামড়ার কোট না-পরা স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদের ওপর সদয় হয়ে ওঠে, আর যখন সোপি পার্কের ভেতরে তার বেঞ্চির উপর অস্বস্তিতে নড়াচড়া করে তখন বুঝতে হবে শীত আসব আসব করছে।

একটা শুকনো পাতা সোপির কোলের উপর উড়ে পড়ল। ওটা শ্রীযুক্ত শীতের পত্র। ম্যাডিসন স্কোয়ারের নিয়মিত বাসিন্দাদের প্রতি শ্রীযুক্ত বেশ সদয়। তিনি তাঁর বাৎসরিক আগমন-বার্তার সতর্কবাণী সময়মতোই দেন। দেন চারমাথার মোড়ে উত্তর বাতাসকে, দেন উন্মুক্ত স্থানের বাসিন্দাদের বাড়ির দারওয়ানকেও, যাতে সব অধিবাসীরা সময় থাকতে প্রস্তুত হতে পারে।

সোপির মনে হল যে, আগামী কষ্টের প্রতিকার করবার সময় এসেছে। তাই সে বেঞ্চির উপর অস্বস্তিকরভাবে নড়াচড়া করে উঠল।

তার শীতকালীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুব উঁচু ধরনের নয়। ভূমধ্যসাগরে জাহাজে চড়ে ঘোরাও নয়, দক্ষিণদেশের নিদ্রালু আকাশের তলাতেও নয়, ভেসুভিয়ান উপসাগরে ভেসে বেড়ানোও নয়, এসব কিছুই নয়। দ্বীপের মধ্যে তিনটে মাস কাটানোই তার সত্যিকারের বাসনা। তিন মাসের নিশ্চিত খাওয়া-শোওয়া, মনের মতো সঙ্গ, পুলিশ আর শীত থেকে নিরাপদ থাকা—জীবনে এর চেয়ে কাম্য জিনিস সোপির কাছে আর নেই।

কয়েক বছর ধরে ব্ল্যাকওয়েলের অতিথিপরায়ণ জেলখানাই হয়ে আসছে তার শীতকালীন আবাসগৃহ। যেমন তার চেয়ে বেশি ভাগ্যবানের দল নিউইয়র্কের লোকেরা পাম-বিচ কিংবা রিভোরার টিকিট কাটে প্রতি শীতকালে, তেমনি সোপিও তার দ্বীপে যাবার বাৎসরিক যাত্রার অন্যান্য আয়োজন করেছিল। এখন এবারেও সেই সময় এসেছে। আগের রাত্রে তিনটে রবিবারের খবরের কাগজ কেটে এবং পা কোলের ভেতরে নিয়েও তার শীত কাটেনি। সেইভাবেই সে সেই পুরনো পার্কের ঝরনার ধারে বেঞ্চির উপর শুয়ে ছিল। সুতরাং দ্বীপের কথাটাই সোপির মনে সবচেয়ে বেশি করে এবং ঠিক সময়ে উদয় হল। শহরের যারা

উপার্জনহীন তাদের জন্যে যে দাতব্যের ব্যবস্থা আছে তার ওপরে সোপির অত্যন্ত ঘৃণা। তার মতে দাতব্যের চেয়ে আইন অনেক সদয়। শহরে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে সাধারণ জীবনের উপযোগী থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে কিন্তু সোপির মতন গর্বিতচিত্ত লোকের কাছে দয়ার দানে অনেক ঝঞ্ঝাট। যদিও পয়সা দিতে হয় না কিন্তু এইসব দাতব্য প্রতিষ্ঠানের দানের বদলে নিজেকে অনেক ছোট করতে হয়। সিজারের যেমন ব্রুটাস ছিল, তেমনি প্রত্যেক দাতব্য-বিছানার জন্যে, স্নান করার ট্যাক্স দিতে হয়, প্রত্যেক রুটির টুকরোর জন্যে ব্যক্তিগত এবং গোপন খোঁজখবর নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তার চেয়ে আইনের অতিথি হওয়া ভালো, কারণ যদিও তা নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা পরিচালিত, তবু সেখানে ভদ্রলোকের নিজস্ব গোপন ব্যাপার নিয়ে অন্যায়ভাবে মাথা ঘামানো হয় না।

দ্বীপে যাবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে সোপি সেটা কার্যে পরিণত করার জন্যে উঠে দাঁড়াল। এর অনেকগুলো পন্থা আছে। সবচেয়ে ভালো পন্থা হচ্ছে কোনো-একটা দামি রেস্টুরেন্টে গিয়ে বেশ পেট ভরে খাওয়া এবং তারপর পয়সা নেই বললেই তারা গোলমাল না করে নিঃশব্দে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে। বাকি কাজটা করবেন সদাশয় ম্যাজিস্ট্রেট।

সোপি বেঞ্চি ছেড়ে উঠল। তারপর পার্ক থেকে বেরিয়ে যেখানে ব্রডওয়ে আর ফিফ্‌থ অ্যাভেনিউ এসে মিশেছে সেই সমতল পিচের রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। ব্রডওয়ের দিকে গিয়ে একটা আলো-ঝলমল হোটেলের সামনে দাঁড়াল। এই হোটেলেই শহরের যত সম্ভ্রান্ত লোকের আমদানি।

সোপির জামার সবচেয়ে নিচের বোতাম থেকে উপর পর্যন্ত নিজের খুব আস্থা ছিল। দাড়িটা কামানো ছিল। তার কালো রঙের কোটটাও ছিল সুন্দর। এক উৎসবের দিনে একজন মিশনারি মহিলা তাকে কোটটা উপহার দিয়েছিলেন। যদি কোনো রেস্টুরেন্টে ঢুকে একটা টেবিলে পৌঁছানো পর্যন্ত কেউ তাকে সন্দেহ না করে তাহলে তার সাফল্য অনিবার্য। টেবিলের উপর থেকে তার যে-অংশটা দেখা যাবে তাতে কোনো ওয়েটারের মনে সন্দেহ জাগবে না। একটা রোস্ট-করা হাঁস, দু-বোতল ভালো পানীয় আর একটি সিগারই যথেষ্ট। সিগারটার দাম বড়জোর এক ডলার। এমন কিছু দামি খাবার নয়, যাতে হোটেলের কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবে, অথচ তার শীতকালীন আশ্রয়স্থলের যাত্রার জন্য সে খেয়ে বেশ সুখী আর তৃপ্ত হবে।

কিন্তু সোপি যেই রেস্টুরেন্টের দরজার ভেতর পা বাড়িয়েছে, হেড ওয়েটারের দৃষ্টি পড়েছে তার পুরনো প্যান্ট আর ছেঁড়া জুতোজোড়ার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হাতে তাকে বাইরে বের করে দিয়েছে, আর সে-ও নিঃশব্দে পাশের রাস্তাটা ধরেছে। সোপি ব্রডওয়ে ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরল। তার মনে হল, তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত দ্বীপে যাত্রা এই সুখাদ্যের পথ দিয়ে আসবে না। জেলখানায় যাওয়ার অন্য কোনো পথের কথা ভাবতে হবে।

সিক্সথ অ্যাভেনিউর কোণে ইলেকট্রিক লাইটের আলোয় কাচের ওধারে একটা দোকানের শো-কেসে অনেকগুলো জিনিস চমৎকারভাবে সাজানো রয়েছে। সহজেই নজরে পড়ে যায়। সোপি একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে কাচের ওপর ছুড়ল। অনেক লোক দৌড়ে এল, আগে আগে একটা পুলিশ, সোপি তার দু-পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আর পুলিশের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। পুলিশটি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে—"যে-লোকটা ঢিল ছুড়ল সে কোথায়?"

সোপি সহজ স্বচ্ছন্দ গলায় উত্তর দিল—"আমাকে দেখে কি মনে হয় এটা আমারই কাজ?"

সোপিকে সামান্যতম সন্দেহও পুলিশের হল না। যারা জানালা ভাঙে তারা পুলিশের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে না, তারা দৌড়ে পালায়। পুলিশটা দেখল একটা লোক কিছুটা দূরে একটা মোটর ধরতে ছুটছে। সে-ও লাঠিটা নিয়ে পেছনে দৌড়ল। সোপি এই দ্বিতীয়বারের অকৃতকার্যতায় বিষণ্ন মনে এগিয়ে চলল।

রাস্তার উল্টোদিকে একটা ছোটখাটো রেস্টুরেন্ট ছিল। ওখানে অল্প পয়সায় বেশি খাবার পাওয়া যায়। একটু নোংরা, এখানকার সুপ আর টেবিলক্লথ নিচু স্তরের। এই হোটেলটার ভেতরেই সোপি তার ছেঁড়া জুতো আর ময়লা প্যান্ট নিয়ে ঢুকল, কেউ তাকে বাধা দিল না। একটা টেবিলে গিয়ে বসে নানান রকম সুখাদ্য খেতে লাগল। তারপর ওয়েটারকে জানাল যে, সে একেবারে কপর্দকহীন।

সোপি বললে—"এখন শিগগির-শিগগির একটা পুলিশ ডেকে নিয়ে এসো, ভদ্রলোককে বেশিক্ষণ বসিয়ে রেখো না।"

ওয়েটার রেগে গেল। মোলায়েম গলায় তার দিকে রক্তচক্ষু মেলে চেয়ে বললেন—"না! তোমার জন্যে পুলিশ ডাকব না।"

তারপর আর একজন ওয়েটারকে ডেকে, দুজনে সোপির বাঁ-কান ধরে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল। আস্তে আস্তে সোপি উঠে দাঁড়াল, যেমন করে ছুতোরদের গজকাঠি ভাঁজে ভাঁজে খোলে ঠিক তেমনি করে। তারপর জামা-কাপড়ের ধুলো ঝাড়ল। পুলিশে-ধরা তার কাছে স্বপ্নেরও অতীত বলে মনে হল। দ্বীপটা অনেক দূরে অপসৃত হয়ে গেল।

একটা পুলিশ দুটো বাড়ির পাশে একটা ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সে একটু হাসল, তারপর রাস্তা ধরে অন্যদিকে চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে সোপির আবার সাহস ফিরে এল। তার মনে হল এবার হয়তো সে ঠিক ধরা পড়বার অবকাশ পাবে। এবার একটা স্বর্ণসুযোগ এসে উপস্থিত হল। একটা দোকানের শো-কেসের সামনে দাড়ি কামাবার মগ আর দোয়াতদানির দিকে একজন ভদ্র তরুণী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল আর তার ঠিক দু-গজ দূরেই একজন বিরাটকায় গম্ভীর স্বভাবের পুলিশ একটা জলের কলের উপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল।

সোপি এক্ষেত্রে একটা লম্পটের ভূমিকা নেবে স্থির করল। মেয়েটির সুশ্রী এবং সম্ভ্রান্ত চেহারা আর পুলিশটার ভাবভঙ্গি দেখে তার কোনো সন্দেহ রইল না যে, পুলিশটা এখুনি তার হাতটা এসে ধরবে আর তার শীতকালীন আশ্রয়স্থল সেই দ্বীপে যাত্রা সুনিশ্চিত হবে।

সোপি তার মিশনারি মহিলার দেওয়া নেকটাইটা সোজা করে নিল, শার্টের হাতাটাও ঠিক করে নিল, তারপর মাথার টুপিটা বাঁকিয়ে নিয়ে তরুণীটির দিকে এগিয়ে গেল। সোপি তার দিকে একটু কটাক্ষ করল, একটু অকারণ কাশল, তারপর লম্পটের ভঙ্গিতে একটু হাসল। চোখের কোণ দিয়ে সোপি দেখল যে, পুলিশটা তাকে লক্ষ করছে। তরুণীটি কয়েক-পা এগিয়ে গেল, তারপর আবার দাড়ি কামাবার মগগুলোর দিকে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। সোপিও অনুসরণ করে একটু সাহসের সঙ্গে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর একহাতে টুপিটা তুলে বললে—"এই যে সুন্দরী! আমাদের বাড়ি যাবে?"

পুলিশটা তখনও দেখছিল। তরুণীটির তখন একটুখানি সঙ্কেতের অপেক্ষা আর সোপি সঙ্গে সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে যাবার পথে রওনা দিতে পারত। ততক্ষণে সোপি জেলখানার নিরিবিলি আরাম প্রায় শুরু করেছে। তরুণীটি হঠাৎ তার দিকে চাইল, তারপর হাত বাড়িয়ে সোপির জামার হাতাটা ধরলে।

হাসিমুখে বললে—"নিশ্চয়ই যাব, আমারও ফুর্তি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি তোমার সঙ্গে আগেই কথা বলতাম, কিন্তু পুলিশটা লক্ষ করছে, তাই পারিনি।'

মেয়েটিকে পাশে নিয়ে সোপি চলতে লাগল। মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরে চলেছে, পুলিশটার মুখ গম্ভীর, সোপির মনে হল যে তার ধরা পড়বার কোনো আশা নেই। পরের বাঁকের মাথায় গিয়ে সোপি তার সঙ্গিনীকে ছেড়ে হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করল, থামল এমন একটা জায়গায় এসে যেখানে রাত্রে বড়লোকদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, যেখানে হৃদয়, প্রতিজ্ঞা সবই হালকা। মেয়েরা ফারের জামা পরে এবং পুরুষেরা ওভারকোট পরে শীতের মধ্যেও আনন্দে যাতায়াত করছে।

সোপির মনে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হল। তার মনে হল যেন সে কোনো ভয়াবহ মন্ত্রের দ্বারা সুরক্ষিত। তার আর ধরা-পড়া হবে না। চিন্তাটা তার মনে একটা যন্ত্রণার সৃষ্টি করল। তারপর সে একটা পুলিশকে দেখতে পেল। পুলিশটা একটা থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোরাঘুরি করছে। হঠাৎ তার মনে 'অসৌজন্যমূলক ব্যবহার' কথাটা উদয় হল।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সোপি কর্কশ গলায় চিৎকার করে মাতলামি করতে লাগল। সে নেচে, চেঁচামেচি করে, মাতলামি করে সেখানকার আবহাওয়া তোলপাড় করতে লাগল।

পুলিশটা লাঠিটা গুটিয়ে নিয়ে সোপির দিকে পেছন ফিরে একজন শহরবাসীকে বলল—"এ একজন ইয়েলের ছোকরা। ওরা যে হার্ডফোর্ড

কলেজকে হাঁসের ডিম দেয় তাই নিয়ে একটু উৎসব করছে। একটু গোলমাল করবে বটে কিন্তু ক্ষতি করবে না। ওপর থেকে আমাদের ওপর হুকুম আছে ওদের কিছু না-বলতে।"

হতাশ হয়ে সোপি চেঁচামেচি বন্ধ করল। একজন পুলিশও কি তাকে ধরবে না? তার মানসচক্ষে দ্বীপটা অনধিগম্য হয়েই রইল। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সে পাতলা কোটের বোতামটা এঁটে দিলে।

একটা চুরুটের দোকানে সে দেখল একজন সুসজ্জিত ভদ্রলোক ঝোলানো আগুনে চুরুট ধরাচ্ছে, তার সিল্কের ছাতাটা দরজায় ঢুকবার মুখে রেখে দিয়েছে। সোপি ভেতরে ঢুকল—তারপর ছাতাটা নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। চুরুটওলা ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গেই তাকে অনুসরণ করল।

ভদ্রলোক কড়া গলায় বললে—"আমার ছাতা?"

সোপি খিঁচিয়ে উঠল। একে চুরি করেছে তার ওপর অপমান করার উদ্দেশ্যে বলল—"বলেন কী? একটা পুলিশ ডাকুন না? আমি নিয়েছিই তো। আপনার যদি ছাতা তাহলে একটা পুলিশ ডাকলেই হয়, ঐ তো কোণে একটা দাঁড়িয়ে আছে।"

ছাতার মালিক গতিটা কমিয়ে দিল—সোপিও তাই। তার মনে হল ভাগ্য বোধহয় এবারও তার বিরুদ্ধে যাবে। পুলিশটা দু'জনার দিকেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাইতে লাগল।

ছাতাওয়ালা ভদ্রলোক বলল—"তা তো বটেই—মানে কী জানেন? এরকম ভুল তো মাঝে মাঝে হয়, আমি—তা এটা যদি আপনার ছাতা হয় তো আমাকে ক্ষমা করুন—আমি আজ সকালে একটা রেস্টুরেন্টে এটা কুড়িয়ে পেয়েছি—আপনি যদি নিজের ছাতা বলে চিনতে পেরে থাকেন তো আপনি—"

সোপি জোর গলায় বললে—"নিশ্চয়ই, এটা আমার।"

ছাতাওয়ালা ভদ্রলোক সরে পড়ল। আর পুলিশটা এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে। রাস্তায় তখন একটা লম্বা ফরসা মহিলা সুসজ্জিত পোশাকে এধার থেকে ওধারে যাচ্ছিল, আর কিছুদূরেই একটা মোটরগাড়ি সেইদিকে এগিয়ে আসছিল।

সোপি পুবদিকের রাস্তাটা ধরে হেঁটে চলল। সে-রাস্তাটা তখন মেরামত হচ্ছিল, জায়গায় জায়গায় খোঁড়া হয়েছে। রাগ করে সোপি ছাতাটা একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিলে। তার মুখ দিয়ে পুলিশদের বিরুদ্ধে কটুভাষা বেরিয়ে এল। কতবার সে তাদের মুঠোর মধ্যে ধরা দিতে চাইছে, কিন্তু তাদের ধারণা যে সে যেন একজন রাজা-মহারাজা, যার দ্বারা কোনো অন্যায় করা সম্ভব নয়।

শেষকালে সোপি পুবদিকে এমন একটা রাস্তায় এসে পৌঁছাল যেখানে আলো আর গোলমাল একটু ক্ষীণ। এই রাস্তা দিয়েই সে ম্যাডিসন স্কোয়ারের দিকে চলতে লাগল। বাড়ির দিকে যাবার কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করল সে, যদিও বাড়ি মানে পার্কের একটা বেঞ্চি।

কিন্তু একটা অস্বাভাবিক নিরিবিলি জায়গায় এসে সোপি চুপ করে থমকে দাঁড়াল। সেখানে একটা অদ্ভুত ধরনের পুরনো গির্জা ছিল। তারই ভায়োলেট রঙের জানলা দিয়ে মৃদু আলো দেখা যাচ্ছিল। ভেতরে নিশ্চয়ই একজন লোক তখন অর্গান বাজাচ্ছিল—পরের রবিবার যে-উপাসনাগীতি হবে তারই মহড়া দিচ্ছিল হয়তো। সেই অর্গানের সুর সোপির কানে আসতেই সে লোহার বেড়াটার ধারে একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মাথার উপরে চাঁদ উঠেছে। উজ্জ্বল আর শান্ত। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া বা লোকজনও কম। ঘুলঘুলিতে চড়াইপাখিগুলো কিচিরমিচির করছে। কোনো গ্রামের গির্জাবাড়ির মতোই আবহাওয়াটা। অর্গান-বাদক যে-উপাসনাগীতি বাজাচ্ছিল তা সোপিকে লোহার বেড়ার সঙ্গে যেন এঁটে দিয়েছে। এ সুর তার যেন বহুকালের চেনা। অনেকদিন আগে যখন তার জীবনে মা ছিল, গোলাপফুল ছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, বন্ধুবান্ধব ছিল, আরও অনেক কিছু ছিল—এ যেন সেইসব দিনের কথা।

সোপির মনের সেই গ্রহণক্ষম অবস্থা আর সেই পুরনো গির্জার প্রভাব—এই দুটি যুক্ত হয়ে তার আত্মায় এক আকস্মিক আশ্চর্য পরিবর্তন এনে দিলে। সে হঠাৎ যেন দেখতে পেল কোনো গহ্বরে সে ডুবেছে। দেখে তার আতঙ্ক হল। সেই ঘৃণ্য দিনগুলো, মূল্যহীন কামনা-বাসনা, মৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রবৃত্তিসমূহ আর নীচ মনোবৃত্তি—এই নিয়েই তো তার যা-কিছু অস্তিত্ব।

সেই মুহূর্তে তার হৃদয় থরথর করে এই নতুন অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিতে সাড়া দিল। হঠাৎ তার মূঢ় ইচ্ছা হল তার হতাশ ভাগ্যের সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে। সে এই কলঙ্ক থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। সে আবার মানুষে পরিণত হবে। যে অসৎ শক্তি তাকে গ্রাস করেছে তাকে সে জয় করবে। এখনও সময় আছে। এখনও তার বয়স কম। সে তার পুরনো উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আবার জাগিয়ে তুলবে আর দ্বিধাহীন চিত্তে তাদের অনুসরণ করবে। সেই গম্ভীর কিন্তু মিষ্টি অর্গানের সুর তার মধ্যে এক বিপ্লবের সূচনা করল। কাল সে পাশের শহরে গিয়ে কাজের চেষ্টা করবে। একবার এক ফার-আমদানিকারক তাকে ড্রাইভারের কাজ দিতে চেয়েছিল। তাকে সে খুঁজে বার করবে কাল। একটা চাকরি চাইবে তার কাছে। সে পৃথিবীর একজন হবে। সে—

সোপির মনে হল তার হাতে যেন কার স্পর্শ পেল। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে দেখল পুলিশের মুখ।

পুলিশটা জিজ্ঞেস করল—"এখানে কী করছ শুনি?"

সোপি বলল—"কিছু না।"

পুলিশটা বলল—"তাহলে আমার সঙ্গে এসো।"

পরের দিন সকালবেলা পুলিশকোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিলেন—"তিন মাসের জেল।"

কৃষণ চন্দর

জঞ্জাল-বুড়ো

যখন সে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, তখন ওর পা দুটি কাঁপছে। ওর সারা শরীর ভেজা তুলোর মতো চুপসে গিয়েছে বলে মনে হয়েছিল। ওর মন চলতে চাইছিল না, ঐ ফুটপাথে বসে পড়তে চাইছিল।

জেল-হাসপাতালে তার আরো এক মাস থাকা উচিত ছিল, কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওকে ছেড়ে দিলেন। হাসপাতালের প্রাইভেট ওয়ার্ডে সে সাড়ে চার মাস ছিল আর দেড় মাস ছিল জেনারেল ওয়ার্ডে। এই সময়ের মধ্যে তার একটি কিডনি অপারেশন করে বাদ দেওয়া হয়েছিল, আর অন্ত্রের এক অংশ কেটে দিয়ে তার অন্ত্রের ক্রিয়া ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। এখনো তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়নি। তবু হাসপাতাল ছেড়ে ওকে চলে আসতে হয়েছিল, কারণ তার চেয়েও খারাপ অবস্থার অন্যান্য রোগীরা অপেক্ষায় ছিল।

ডাক্তার তার হাতে এক লম্বা পেসক্রিপশন দিয়ে বলেছিল, 'এই টনিক খেয়ো আর পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ো। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে। এখন আর হাসপাতালে থাকার কোনো আবশ্যকতা নেই।'

'ডাক্তার সাহেব, আমি যে আর হাঁটতে পারছি না।' সে ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিল।

'ঘরে যাও, কিছুদিন বিবি সেবাযত্ন করবে, বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে।'

খুব ধীরে ধীরে টলমলে পদক্ষেপে ফুটপাথ দিয়ে চলতে চলতে ভেবেছিল, 'ঘর!—কিন্তু আমার ঘর কোথায়?'

কিছুদিন আগেও আমার একটি ঘর নিশ্চয় ছিল—এক বিবিও ছিল—তার এক বাচ্চা হবার কথা ছিল—তারা দু'জনে ঐ আগতপ্রায় বাচ্চার কল্পনায় কত খুশি হয়েছিল। দুনিয়ার জনসংখ্যা অনেক হতে পারে, কিন্তু সে তো তাদের দু'জনের প্রথম সন্তান ছিল। দুনিয়ায় তাদের প্রথম সন্তান জন্ম নিতে আসছিল।

দুলারী নিজের বাচ্চার জন্য খুব সুন্দর জামা সেলাই করেছিল। হাসপাতালে তা নিয়ে এসে দেখিয়েছিল আর ঐ জামায় হাত বুলিয়ে তার মনে হয়েছিল যে, সে তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করছে।

কিন্তু গত কয়েক মাসের মধ্যে তাকে অনেক কিছুই হারাতে হল। যখন তার কিডনির প্রথম অপারেশন হল তখন দুলারী নিজের গয়না বেচে দিয়েছিল, কারণ গয়না তো এইরকম সময়ের জন্যই। লোকে ভাবে গয়না স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য, কিন্তু আসলে অন্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য তার ব্যবহার হয়। স্বামীর অপারেশন, বাচ্চাদের লেখাপড়া, মেয়ের বিয়ে—এইসব প্রয়োজনের জন্যই স্ত্রীলোকের গয়নার ব্যাংক খালি করে দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকই গয়নাগাটি সামলাতে ব্যস্ত থাকে, আর জীবনে বড়জোর পাঁচ-ছ'বার এই গয়না পরবার সৌভাগ্য লাভ করে।

কিডনির দ্বিতীয় অপারেশনের আগে দুলারীর বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেল। তা তো বটেই—দুলারীকে দিনরাত খুব খাটুনি পোয়াতে হয়েছিল, তার জন্যে এই বিপদ গোড়াতেই জমা ছিল। মনে হয়েছিল যে, দুলারীর একহারা উজ্জ্বল শরীর এই কড়া খাটুনির জন্য তৈরি হয়নি। এইজন্য ঐ বুদ্ধিমান বাচ্চা মাঝপথেই সরে পড়েছিল। বিরূপ পরিবেশ আর বাপ-মায়ের দুর্দশা আঁচ করতে পেরে সে নিজেই বুঝেছিল জন্ম নেওয়া উচিত হবে না। কোনো কোনো বাচ্চা এরকম বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। দুলারী কিছুদিন হাসপাতালে আসতে পারেনি, তারপর যখন এসে সে খবরটা দিল তখন দুলারীর স্বামী খুব কেঁদেছিল। যদি তার জানা থাকত যে ভবিষ্যতে তাকে আরো অনেক কাঁদতে হবে তাহলে এই ঘটনায় কান্নার বদলে সে সন্তোষ প্রকাশ করত।

কিডনির দ্বিতীয় অপারেশনের পর তার চাকরি চলে গেল। দীর্ঘকালীন রোগভোগে এইরকমই হয়। কে আর কতদিন অপেক্ষা করতে পারে। রোগ তো মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। এই কারণে যদি সে চায় যে তার চাকরি বজায় থাকবে তবে তার দীর্ঘদিনের রোগভোগে পড়া ঠিক হবে না। মানুষ যন্ত্রের মতোই। যদি কোনো যন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে বিগড়ানো অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে একধারে ফেলে রেখে দেওয়া হয় আর তার জায়গায় নতুন যন্ত্র এসে যায়। কারণ কাজ থেমে থাকতে পারে না, ব্যবসা বন্ধ হতে পারে না, আর সময় থেমে থাকতে পারে না। কাজেই যখন তার উপলব্ধি হল যে তার চাকরি চলে যাচ্ছে, তখন দ্বিতীয়বার কিডনি অপারেশনের সময় যে-রকম ধাক্কা লেগেছিল সে-রকমই ধাক্কা লাগল। এই ধাক্কায় তার চোখ দিয়ে জলও পড়েনি। সে অনুভব করেছিল, তার হৃদয়ের মধ্যে এক শূন্যতা বিরাজ করছে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে আর নাড়িতে রক্তের বদলে ভয় দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে।

কিছুদিন যাবৎ আগামী দিনগুলোর কথা ভেবে ভয়ে সে ঘুমোতে পারেনি। অনেকদিনের রোগের চিকিৎসায় খরচও হল অনেক। এক-এক করে ঘরের সব দামি জিনিস বিক্রি হয়ে গেল, কিন্তু দুলারী হাল ছেড়ে দিল না। সে তার স্বামীকে সাড়ে চার মাস প্রাইভেট ওয়ার্ডে রেখেছিল, তার সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা

করিয়েছিল, এক-এক করে নিজের ঘরের সব জিনিস বেচে দিয়েছিল আর শেষ পর্যন্ত চাকরিও নিয়েছিল। দুলারী এক ফার্মে কর্মচারী হয়ে গেল। একদিন তাদের ফার্মের মালিককে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিল। মালিক এক রোগা-পাতলা বেঁটেমতো লোক। তাকে দেখায় মাঝবয়েসি আর লাজুক। তাকে দেখতে-শুনতে কোনো ফার্মের মালিকের বদলে কোনো দোকানের মালিক বলে মনে হয়। দুলারী ঐ ফার্মে দুশো টাকার মাস-মাহিনার কর্মচারী হয়ে গেল, কেননা সে খুব বেশি লেখাপড়া জানত না, তাই তার কাজ ছিল খামের উপর ডাকটিকিট লাগানো।

দুলারীর স্বামী বলল, 'এ তো খুব সহজ কাজ।'

ফার্মের মালিক বললেন, 'কাজ তো সোজাই, কিন্তু যেদিন পাঁচ-ছশো চিঠির খামের উপর টিকিট লাগাতে হয়, সেদিন এই খুব সোজা কাজই খুব কঠিন মনে হয়।'

দুলারী মুচকি হেসে বলল, 'সত্যি খুব হয়রান হয়ে যাই।'

ফার্মের মালিক তাকে বললেন, 'তুমি সেরে ওঠো, তারপর তুমি তোমার বিবির বদলে খামে টিকিট লাগিয়ো, আমি এই কাজ তোমাকে দেব।'

যখন ফার্মের মালিক চলে যাচ্ছেন তখন দুলারীও তার সঙ্গে চলে গেল। সে (দুলারীর স্বামী) অনুভব করল যে, আজ দুলারীর পদক্ষেপে এক অদ্ভুত আত্মমর্যাদা প্রকাশ পাচ্ছে। দুলারীর শরীর কোনো এক ফুলন্ত ডালের মতো নমনীয় হয়ে গেছে। ওয়ার্ডের বাইরে এসে মালিক দুলারীর জন্যে এক হাতে দরজা খুলে ধরলেন আর খাতির করে দুলারীকে দরজার বাইরে যেতে সাহায্য করার জন্য কিছুটা ঝুঁকে পড়লেন, আর এক মুহূর্তের জন্য তাঁর অপর হাত দুলারীর কোমরের উপর রাখলেন। ফার্মের মালিকের প্রথম হাতের ভঙ্গি দুলারীর স্বামীর ভালো লেগেছিল কিন্তু দ্বিতীয় হাতের ভঙ্গি পছন্দ হয়নি। কিন্তু সে আপন মনকে এ-কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে, কখনো কখনো এক হাত যা করে তা অপর হাত জানতে পারে না। আবার এ-ও তো হতে পারে যে তার চোখের নজর ঠিক চলেনি—কেবল ভ্রম মাত্র—এ কারণে সে বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের চোখদুটি বন্ধ করে নরম নরম বালিশের উপর মাথা রেখে গ্লুকোজ ইনজেকশনের প্রতীক্ষা করেছিল।

তার তৃতীয় অপারেশন হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে হয়েছিল। সে-সময় দুলারী ফার্মের মালিকের সঙ্গে দার্জিলিং চলে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কে আর কতদিন অপেক্ষা করতে পারে! জীবন ক্ষণস্থায়ী আর জীবনের বসন্ত তার চেয়েও ক্ষণস্থায়ী। যখন আবেগ প্রবল হয় আর চোখে নেশা লাগে, যখন আঙুলের ডগায় আগুনের জ্বলুনি অনুভূত হয় আর বুকে মিষ্টি-মিষ্টি বেদনা হতে থাকে, যখন চুম্বন ভ্রমরের মতো ওষ্ঠের পাপড়ির উপর এসে পড়ে আর বঙ্কিম হংসগ্রীবা কারুর গরম-গরম নিশ্বাসের মৃদু মৃদু আঁচে ব্যাকুল হয়, তখন কেউ কতদিন পর্যন্ত ফিনাইল আর পেচ্ছাবের গন্ধ শুঁকতে পারে! থুতু, পুঁজ আর রক্তের রঙ দেখতে

পারে আর মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে আসা হেঁচকি শুনতে পারে? সহ্য করার একটা সীমা আছে; বিশ বছরের যুবতী কী সহ্য করেনি? যার বিয়ের পর দু'বছরও পেরোয়নি, যে আপন পতির সঙ্গে বিপদ ছাড়া আর কিছুই দেখেনি, সে যদি আপন স্বপ্নে ভর করে দার্জিলিং চলে যায় তবে কার কী দোষ তাতে?

দুলারী যখন বাড়ি থেকে চলে যায় তখন অন্য কাউকে দোষী বলার মতো অবস্থা দুলারীর স্বামীর ছিল না। তার ওপর একটার-পর-একটা এত আঘাত এসেছিল যে সে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তখন তার বিপদ আর কষ্টে কোনো ভাবনা বা অশ্রু ছিল না। বারবার হাতুড়ির চোট খেয়ে তার হৃদয় ধাতুর পাতের মতো হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে আজ সে (দুলারীর স্বামী) যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল তখন সে ডাক্তারের কাছে কোনো মানসিক পীড়ার কথা বলেনি। সে ডাক্তারকে বলেনি, এই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এখন সে কোথায় যাবে? এখন তার নেই কোনো ঘর, নেই বিবি, নেই বাচ্চা, নেই কোনো চাকরি, তার হৃদয় শূন্য, তার পকেট ফাঁকা; তার সামনে এক বিরাট শূন্য ভবিষ্যৎ।

কিন্তু তখন সে কোনো কথাই বলেনি, কেবল বলেছিল, 'ডাক্তার সাহেব, আমি আর চলতে পারছি না।'

ঐ একমাত্র সত্য তখন সে অনুভব করেছিল, বাকি সব কথা তার মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এসময় চলতে চলতে সে কেবল অনুভব করতে পারল যে তার শরীর ভিজে-তুলো দিয়ে তৈরি, তার শিরদাঁড়া কোনো পুরনো ভাঙা চারপাইয়ের মতো খটখট করছে। রোদের তেজ খুব, আলো তীরের মতো চোখে বিঁধছে যেন আকাশে এক ময়লা হলুদ রঙের বার্নিশ লেপে দেওয়া হয়েছে, সারা পরিবেশ কালো ঘোলাটে আর জড়ো-হওয়া নোংরা মাছির মতো ভনভন করছে আর লোকের দৃষ্টি যেন তার গায়ের নোংরা রক্ত ও পুঁজের মতো তার শরীরে সেঁটে যাচ্ছে। তাকে কোথাও পালিয়ে যেতে হবে, দূরে কোথাও লম্বা লম্বা তার-জড়ানো আলোর থামওয়ালা রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, তার মধ্যদিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি পথ ধরে অনেকদূরে পালিয়ে যেতে হবে। তার মনে হয় তার মরা মায়ের কথা, তার মরা বাপের কথা, তার আফ্রিকা-চলে-যাওয়া ভাইয়ের কথা। শন্-শন্-শন্ শব্দ করে একখানা ট্রাম তার কাছ দিয়ে চলে গেল। ট্রামের বিজলির ট্রলি, বিজলির লম্বা তারে ঘষতে ঘষতে যেন তার শরীরে ঢুকে যেতে লাগল। তার আপন শরীরে পুরো ট্রামটাই ঢুকে যাচ্ছে বলে সে অনুভব করল, তার মনে হয় সে যেন কোনো মানুষ নয়, যেন এক ক্ষয়ে-যাওয়া রাস্তা।

অনেকক্ষণ ধরে সে চলছিল, হাঁপিয়ে পড়ছিল আর চলছিল। আন্দাজে এক অজানা দিকে চলছিল—যেদিকে কোনো-একদিন তার ঘর ছিল। এখন তার মনে হয়েছে তার কোনো ঘর নেই। কিন্তু এ-কথা জেনেও সে ঐদিকেই চলছিল, ঘরে

যাবার তাগিদে অসহায় হয়ে সে পথ চলছিল। কিন্তু রোদ ছিল খুব চড়া, তার শরীরে পোকা কিলবিল করছিল আর সে রাস্তাও ভুলে গিয়েছিল। তখন তার শরীরে এমন শক্তি ছিল না যে সে কোনো পথিকের কাছে রাস্তার খোঁজ নেয়, জেনে নেয় শহরের একটা কোনো অঞ্চল। ধীরে ধীরে তার কানের মধ্যে ট্রাম আর বাসের আওয়াজ বাড়তে লাগল, চোখের সামনে দেয়াল বাঁকা হয়ে যেতে লাগল, বাড়িঘর ভেঙে পড়তে লাগল, বিজলিবাতির থামগুলো ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যেতে লাগল। সে তার চোখের সামনে আঁধার আর পায়ের তলায় ভূমিকম্প অনুভব করল আর হঠাৎই মাটিতে পড়ে গেল।

যখন তার হুঁশ ফিরে এল, তখন রাত হয়ে গেছে, এক ঠাণ্ডা আঁধার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সে চোখ খুলে দেখল, যে জায়গায় সে পড়ে গিয়েছিল এখন পর্যন্ত সেই জায়গাতেই শুয়ে আছে। এটা ফুটপাথের এমন একটা মোড় যার পিছনে দু'দিকে দুই দেয়াল খাড়া হয়ে আছে। এক দেয়াল ফুটপাথের গায়ে গায়ে সোজা উত্তর থেকে দক্ষিণদিকে চলে গেছে, অপর দেয়াল উত্তর থেকে পশ্চিমদিকে চলে গেছে, আর দুই দেয়ালের জোড়ের মুখে সে শুয়েছিল। এ দুই দেয়াল প্রায় চার ফুট উঁচু আর এই দেয়ালগুলোর পিছনে ছিল বাঁশঝাড় আর ম্যাগনোলিয়া লতার ঝাড়, পেয়ারা আর জামগাছ। ঐসব গাছের পিছনে কী ছিল তা সে দেখতে পায়নি। অন্যদিকে পশ্চিমদিকের দেয়ালের সামনে পঁচিশ-তিরিশ ফুট ছেড়ে দিয়েছিল এক পুরনো বাড়ির পিছনের অংশ। বাড়িটি তিনতলা; প্রতি তলার পিছনদিকে একটি জানালা আর ছ'টি বড় বড় পাইপ। পিছনদিকের পাইপ আর পশ্চিমদিকের দেয়ালের মাঝখানে এক পঁচিশ-তিরিশ ফুট চওড়া কানাগলি, তার তিনদিকে দেয়াল আর চতুর্থ দিকে পথ। দূরে কোথাও গির্জার ঘণ্টায় রাত তিনটে বাজল। সে ফুটপাথের উপর শুয়ে শুয়ে কনুইয়ের ওপর জোর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে এদিক-ওদিক দেখতে থাকে। পথ একেবারে খালি। সামনের দোকানগুলো বন্ধ আর ফুটপাথের আঁধারে ছায়ায় কোথাও কোথাও কমজোর বিজলিবাতি ঝলমল করছে। কিছুক্ষণের জন্য এই ঠাণ্ডা আঁধার তার খুব ভালো লাগল। কিছুক্ষণের জন্য সে নিজের চোখদুটি বন্ধ করে ভাবল, সে বোধহয় কোনো দয়ার সমুদ্রের জলে ডুবে যাচ্ছে।

কিন্তু এই অনুভূতি দিয়ে সে নিজেকেই কিছুক্ষণের জন্য ধোঁকা দিচ্ছিল, কারণ তার খুব খিদে পেয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য আরামদায়ক ঠাণ্ডা উপভোগের পর সে অনুভব করল যে তার খুব খিদে পেয়েছে। তার অন্ত্রের অপারেশন হওয়ার পর থেকে তার খুব খিদে পায়। সে ভাবল যে ডাক্তার তার অন্ত্রের কাজ জাগিয়ে দিয়ে, তার কোনোরকম উপকার করেননি। পেটের মধ্যে নাড়ি বিচিত্রভাবে পাক খাচ্ছিল আর অন্ত্রের একেবারে ভিতরে মোচড় দিচ্ছিল, আহারের জানান দিচ্ছিল। এ-সময়ে তার নাসিকা সভ্য নাগরিকের নাসিকার মতো কাজ করছিল না, বরং কোনো জংলি

পশুর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মতো কাজ করছিল। তার নাকে নানা বিচিত্র গন্ধ আসছিল। সুগন্ধের এক ঐকতান তার চেতনায় ছড়িয়ে পড়ছিল। আর আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সুগন্ধ-ঐকতানের এক-এক সুরের আলাদা আলাদা অস্তিত্ব সে চিনে নিতে পারছিল। এই হল জামের গন্ধ, এটা হল পেয়ারার গন্ধ, এটা হল রজনীগন্ধার কলির গন্ধ, এ হল তেলে-ভাজা পুরির গন্ধ। এটা হল পেঁয়াজ-রসুনে সাঁতলানো আলুর গন্ধ, এটা মুলোর গন্ধ, এটা টমেটোর গন্ধ, এটা হল কোনো পচা ফলের গন্ধ, এটা পেচ্ছাবের গন্ধ, এটা জলে-ভেজা মাটির গন্ধ—বোধহয় নানা গন্ধের সমাবেশ থেকেই আসছিল। এইসব গন্ধের প্রতিটি রূপ, ধরন, গতি আর উগ্রতা পর্যন্ত সে অনুভব করতে পারছিল। হঠাৎ তার সম্বিৎ হল, আর কী বুভুক্ষা তার সুপ্ত ঘ্রাণশক্তিকে সজাগ করে দিয়েছে তা ভেবে সে চমকে উঠল। কিন্তু এই কথা নিয়ে বেশি ভাবনা-চিন্তা না করে যেদিক থেকে তেলে-ভাজা পুরি আর রসুনে-সাঁতলানো আলুর গন্ধ আসছিল সেইদিকে শরীরটাকে ঘেঁষে ধীরে ধীরে আঁধার গলির ভিতরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল, কারণ নিজের শরীরে হাঁটবার সামর্থ্য সে একেবারেই পাচ্ছিল না। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল যে, সে গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে। আগে মনে হচ্ছিল যে, কোনো ধোপা তার পেটের অন্ত্রগুলোকে ধরে মোচড় দিচ্ছে। আবার তার নাসারন্ধ্রে পুরি আর আলুর ক্ষিদে-জাগানো গন্ধ আসছিল। সে অধীর হয়ে আধ-বোজা চোখে নিজের প্রায় নির্জীব শরীরটাকে ঘেঁষে টেনে নিয়ে যেদিক থেকে আলু-পুরির গন্ধ আসছিল সেদিকে যেতে চেষ্টা করল।

খানিকটা সময় পরে সে যখন ঐ স্থানে পৌছল তখন দেখল, পশ্চিমের দেয়াল আর তার সামনের ইমারতের পিছনদিকের পাইপগুলোর মাঝখানে পঁচিশ-তিরিশ ফুট ব্যবধানে আবর্জনার একটা খুব বড় খোলা লোহার টব রয়েছে। এই টবটা পনেরো ফুট চওড়া আর তিরিশ ফুট লম্বা। রকমারি আবর্জনায় ভরা। পচা-গলা ফলের খোসা, পাঁউরুটির ময়লা টুকরো, চায়ের পাতা, একটা পুরনো জ্যাকেট, বাচ্চাদের নোংরা ন্যাকড়া, ডিমের খোলা, খবরের কাগজের ছেঁড়া টুকরো, পত্রিকার ছেঁড়া পাতা, রুটির টুকরো, লোহার পাত, প্লাস্টিকের ভাঙা খেলনা, কড়াইশুঁটির খোসা, পুদিনার পাতা, কলার পাতায় কিছু এঁটো পুরি আর আলুর তরকারি। পুরি আর আলুর তরকারি দেখে তার পেটের মধ্যে মোচড় দিল। কিছু সময়ের জন্য সে তার অধীর হাত টেনে নিল, কিন্তু আর সব সুগন্ধ যখন তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল তখন আগের পুরি আর তরকারির ক্ষিদে-জাগিয়ে-দেওয়া সুগন্ধ তীব্র হয়ে উঠল। মনে হল, ঐকতানের বিশেষ কোনো স্বর হঠাৎ খুব চড়া হয়ে বেজে উঠল আর হঠাৎই সংযমের শেষ প্রাচীর ভেঙে পড়ল। তখনি তার কম্পিত অধীর হাত কলার পাতা খাবলে নিল আর অমানুষিক ক্ষুধা অসহায় হয়ে ঐ পুরিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুরি-তরকারি খেয়ে সে বারবার কলার পাতা চাটল। পাতাখানিকে চেটে এত সাফ করে দিয়েছিল

যে, মনে হল তা গাছের নতুন পাতা। কলার পাতা চাটার পর সে নিজের আঙুল চাটল আর লম্বা লম্বা নখের মধ্যে জমে-থাকা আলুর তরকারি জিভের ডগা দিয়ে চেটে নিয়ে খেল। এতেও তার তৃপ্তি হল না। সে হাত বাড়িয়ে আবর্জনারাশি নেড়ে নেড়ে তার থেকে পুদিনার পাতা বার করে খেল; মুলোর দুটি টুকরো আর আধখানা টমেটো মুখে দিয়ে আরাম করে তার রস খেল। আর সব যখন খাওয়া হয়ে গেল তখন তার সারা শরীরে আলস্যভরা ঘুমের ঢেউ নেমে এল। সে ঐ টবের ধারেই ঘুমিয়ে পড়ল।

আট-দশদিন এইভাবেই আলস্যভরা ঘুম আর অর্ধচেতনার মধ্যে কেটে গেল। সে ঘষতে ঘষতে টবের ধারে যেত। যা খাবার পাওয়া যেত তা খেয়ে নিত। আর যখন ক্ষিদে-জাগানো গন্ধের তৃপ্তিসাধন হয়ে যেত তখন তা ছাপিয়ে অন্য নোংরা গন্ধ উঠত। তখন সে ঘষতে ঘষতে টব থেকে দূরে ফুটপাথের মোড়ে চলে গিয়ে পিছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

পনেরো-বিশদিন পরে ধীরে ধীরে তার শরীরে বল ফিরে এল। ধীরে ধীরে সে নিজের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে—এই জায়গা কেমন ভালো—এখানে রোদ নেই, এখানে আছে গাছের ছায়া, কখনো কখনো পিছনের ইমারত থেকে কেউ জানালা খুলত আর কেউ হাত ঘুরিয়ে নিচের টবে রোজ আবর্জনা ফেলত। এই আবর্জনা ছিল তার অন্নদাতা, তাকে দিনে-রাতে আহার দিত। এ ছিল তার জীবন-রক্ষক। দিনে পথ মুখরিত হয়ে উঠত, দোকানপাট খুলত, লোকজন ঘুরে বেড়াত, বাচ্চারা পাখির মতো কিচিরমিচির করতে করতে পথ দিয়ে যেত, স্ত্রীলোকেরা রঙিন ঘুড়ির মতো হেলেদুলে চলে যেত—কিন্তু তা ছিল অন্য এক জগৎ। এই জগতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, এই জগতে তার কেউ ছিল না আর সে কারুর ছিল না। এই দুনিয়ার প্রতি তার ছিল ঘৃণা। এই দুনিয়া থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। শহরের গলি-বাজার-পথ তার কাছে ছিল এক ধোঁয়াটে ছায়ায় তৈরি জগৎ। বাইরের মাঠ, ক্ষেত আর খোলা আকাশ তার কাছে ছিল এক ব্যর্থ কল্পনা। ঘরসংসার, কাজকর্ম, জীবন, সমাজসংঘর্ষ—এইসব অর্থহীন শব্দ পচে গেলে আবর্জনারাশিতে গিয়ে মিশেছিল। ঐ দূরের জগৎ থেকে সে তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এই ছিল তার নিজের জগৎ—পনেরো ফুট লম্বা আর তিরিশ ফুট চওড়া।

মাস আর বছর চলে গেল। সে ঐ পথের মোড়ে বসে থাকত। লোকের দৃষ্টিতে সে ছিল এক পুরনো ন্যাড়া গাছের মতো, এক পুরনো স্মৃতিচিহ্নের মতো। সে কারুর সঙ্গে কথা বলত না, কাউকে সাহায্য করত না, কারুর কাছে ভিক্ষে চাইত না। কিন্তু যদি কোনোদিন সে উঠে চলে যেত তো সেখানকার প্রতিটি ব্যক্তি এতে বিস্মিত হত, আর বোধহয় কিছুটা দুঃখিত হত।

সবাই তাকে বলত জঞ্জাল-বুড়ো। কারণ সবাই জানত যে, সে কেবল জঞ্জালের টব থেকেই আপন আহার্য সংগ্রহ করে খেত। আর যেদিন তা থেকে কিছু মিলত

না, সেদিন সে না-খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ত। বছরের-পর-বছর ধরে পথিকেরা আর ইরানি রেস্তোরাঁওয়ালারা তার এই স্বভাবের কথা জেনেছিল। তার জন্য যা-কিছু দেবার তারা প্রায়ই জঞ্জাল-স্তূপে ফেলে দিত। আবার ইমারতের পিছনের জানালা দিয়ে ময়লা-আবর্জনার অতিরিক্ত অন্য খাবার জিনিস প্রায়ই লোকে ফেলে দিত। আস্ত আস্ত পুরি, কাবাব, অনেকটা তরকারি, মাংসের টুকরো, আধ-খাওয়া আম, চাটনি, কাবাবের টুকরো আর ক্ষীরমাখানো কলাপাতা। খাওয়া-পরার সব ভালোমন্দ জিনিস জঞ্জাল-বুড়ো এই টবের মধ্যেই পেয়ে যেত। কখনো কখনো ছেঁড়া পাজামা, ফেলে-দেওয়া জাঙিয়া, ধুলধুলি-ছেঁড়া জামা, প্লাস্টিকের গেলাস। এ কি আবর্জনার টব? তার জন্যে এটা ছিল খোলা বাজার—যেখানে সে দিনে-দুপুরে সকলের চোখের সামনে গালগল্প করত। যে দোকানে যে সওদা প্রয়োজন তা সে বিনা পয়সায় নিত। এই বাজারের সে ছিল একমাত্র মালিক। গোড়ায় গোড়ায় কয়েকটি ক্ষুধার্ত বিড়াল আর ঘেয়ো কুকুর তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। কিন্তু মারমার করে সে তাদের ভাগিয়ে দিয়েছিল। এখন সে এই টবের একমাত্র অধীশ্বর হয়েছিল। সবাই তার অধিকার মেনে নিয়েছিল। মাসে একবার মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা আসত আর এই টব খালি করে দিয়ে চলে যেত। জঞ্জাল-বুড়ো তার বিরোধিতা করত না কারণ তার জানা ছিল পরদিন থেকেই টব আবার ভর্তি হতে শুরু করবে। তার বিশ্বাস ছিল যে, এই দুনিয়ায় মঙ্গল শেষ হয়ে যেতে পারে, প্রেম শেষ হয়ে যেতে পারে, বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আবর্জনা কোনোদিন শেষ হয়ে যাবে না। সারা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বাঁচার শেষ উপায় শিখে নিয়েছিল।

কিন্তু কথা এ নয় যে, সে বাইরের দুনিয়ার খবর রাখত না। যখন শহরে চিনির দাম বেড়ে যেত তখন মাসের-পর-মাস আবর্জনার টবে মিঠাইয়ের টুকরোর চেহারা দেখা যেত না। যখন গমের দাম বেড়ে যেত তখন পাঁউরুটির টুকরোও মিলত না। যখন সিগারেটের দাম বেড়ে যেত তখন এত ছোট সিগারেটের পোড়া টুকরো মিলত যে সে তা ধরিয়ে ধূমপান করতে পারত না। যখন জমাদারেরা হরতাল করেছিল তখন দু'মাস ধরে টবের কোনো সাফাই হয়নি। আবার বক্‌রি-ঈদের দিন যত মাংসের টুকরো মিলত তা অন্যদিন পাওয়া যেত না। দেয়ালির দিন তো টবের আলাদা আলাদা কোণে মিঠাইয়ের অনেক টুকরো পাওয়া যেত। বাইরের দুনিয়ার এমন কোনো ঘটনা ছিল না যার সন্ধান সে আবর্জনার টব থেকে না সে এখানে পেত। গত মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে মেয়েদের গোপন ব্যাধি পর্যন্ত সবকিছুরই সন্ধান পেত। কিন্তু বাইরের দুনিয়ার প্রতি তার কোনো রুচি ছিল না।

পঁচিশ বছর ধরে সে এক আবর্জনার টবের ধারে বসে-বসে আপন জীবন কাটিয়ে দিল। দিন-রাত, মাস-বছর তার মাথার উপর দিয়ে বায়ুতরঙ্গের মতো প্রবাহিত হয়ে গেল। তার মাথার চুল শুকিয়ে শুকিয়ে বটগাছের ঝুরির মতো

ঝুলতে লাগল। তার কালো দাড়ি সাদা হয়ে গেল। তার গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেল, মেটে আর বেগুনি রং হয়ে গেল। নোংরা চুল, ছেঁড়া ন্যাকড়া আর দুর্গন্ধভরা শরীর নিয়ে পথচারীর কাছে সে নিজেই যেন একটা জঞ্জাল-টবের মতো প্রতিভাত হত। সে ছিল এমন একটা টব যা কখনো কখনো অঙ্গভঙ্গি করত, আর অন্যের সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গে আর জঞ্জাল-টবের সঙ্গে কথা বলত।

জঞ্জাল-বুড়োকে জঞ্জাল-টবের সঙ্গে কথা বলতে দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে যেত। কিন্তু এতে আশ্চর্যের কথা কী আছে? জঞ্জাল-বুড়ো লোকদের সঙ্গে কোনো কথা বলত না, কিন্তু ওদের আশ্চর্য হতে দেখে মনে মনে নিশ্চয় ভাবত যে, এই সংসারে কে আছে যে অপরের সঙ্গে কথা বলে! বাস্তবে এই সংসারে যত কথাবার্তা হয় তা মানুষের মধ্যে হয় না, হয় কেবল নিজের জাতের সঙ্গে আর তাদের কোনো স্বার্থের মধ্যেই। দুই বন্ধুর মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তা বাস্তবে একপ্রকার স্বগত-কথন মাত্র। এই দুনিয়াটা একটা খুব বড় আবর্জনার স্তূপ। এখানে সব লোক আপন আপন স্বার্থের কোনো টুকরো, ব্যক্তিগত লাভের কোনো খোসা বা মুনাফার কোনো ন্যাকড়া খাবলানোর জন্যে সবসময় তৈরি হয়ে আছে। যারা আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বা নীচ মনে করে তারা মনের পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখুক—সেখানে কত-না ময়লা আবর্জনা রয়েছে। ঐ আবর্জনা কেবল যমরাজই উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

এইভাবে দিনের-পর-দিন যায়, কত দেশ স্বাধীন হল, কত দেশ পরাধীন হল, কত সরকার এল, কত সরকার গেল, কিন্তু জঞ্জালের এই টব যেখানে ছিল সেখানেই আছে আর তার কিনারে জঞ্জাল-বুড়ো ঐভাবেই অর্ধচেতনভাবে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে থাকত, মনে মনে বকবক করত, জঞ্জালের টব হাতড়াত।

তারপর এক রাতে ঐ আঁধার গলিতে যখন সে টব থেকে কয়েক ফুট দূরে দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে ছেঁড়া কাপড় গায়ে কুঁজো হয়ে ঘুমোচ্ছিল, তখন সে এক খুব তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে ঘাবড়ে গিয়ে জঞ্জাল-টবের দিকেই দৌড়েছিল। তারই ভিতর থেকে ঐ তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা যাচ্ছিল।

জঞ্জালের টবের কাছে গিয়ে সে টব হাতড়াল। তখন তার হাত কোনো নরম-নরম মাংসপিণ্ডে ধাক্কা খেল। আর একবার তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। জঞ্জাল-বুড়ো দেখল টবের মধ্যে পাঁউরুটির টুকরো, চোষা হাড়, পুরনো জুতো, কাচের টুকরো, আমের খোসা, বাসি চাট আর টেড়াভাঙা বোতলের মাঝখানে এক নবজাত উলঙ্গ শিশু পড়ে আছে আর হাত-পা নেড়ে নেড়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে।

এ-সময় পর্যন্ত জঞ্জাল-বুড়ো আশ্চর্য হয়ে এই মানবটিকে দেখছিল। বাচ্চাটি নিজের ছোট্ট বুকের সব জোর দিয়ে নিজের আগমন ঘোষণা করছিল। বুড়ো খানিকক্ষণ চুপচাপ হতভম্ব হয়ে চোখ বড় বড় করে এই দৃশ্য দেখতে থাকে। তারপর তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকে পড়ে জঞ্জালের টব থেকে বাচ্চাকে নিজের বুকে তুলে নিয়ে তাকে ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে নিল।

কিন্তু বাচ্চা তার কোলে গিয়ে কোনোমতেই চুপ করে থাকেনি। সে এ জীবনে সদ্য-সদ্য এসেছে, তারস্বরে নিজের ক্ষুধা ঘোষণা করছিল। সে এখনো বোঝেনি দারিদ্র্য কী হতে পারে, মমতা কতটা ভীরু হতে পারে, জীবন কীভাবে বিগড়ে যেতে পারে, জীবনকে কীভাবে ময়লা দুর্গন্ধময় হয়ে জঞ্জালের টবে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। এখন তার কিছুই জানা নেই। এখন সে কেবল ক্ষুধার্ত। সে কেঁদে কেঁদে নিজের পেটে হাত রাখছিল আর পা ছুড়ছিল।

জঞ্জাল-বুড়ো কিছুতেই বুঝতে পারছিল না সে কী করে এই বাচ্চাকে চুপ করাবে। তার কাছে কিছুই ছিল না—না দুধ, না চুষিকাঠি। তার তো কোনো ছড়াও জানা নেই। সে অস্থির হয়ে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চাপড়াতে শুরু করল আর খুব হতাশ হয়ে রাতের আঁধারে চারদিকে চেয়ে দেখল এ সময়ে বাচ্চার জন্যে কোথায় দুধ পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন তার মাথায় কিছু এল না তখন সে তাড়াতাড়ি জঞ্জালের টব থেকে একটা আমের আঁটি বার করে নিয়ে তার প্রান্তভাগ বাচ্চার মুখে দিয়ে দিল।

আধ-খাওয়া আমের মিষ্টি-মিষ্টি রস যখন বাচ্চার মুখে যেতে থাকল তখন সে কাঁদতে কাঁদতে চুপ করে গেল আর আস্তে আস্তে জঞ্জাল-বুড়োর কোলে ঘুমিয়ে গেল। আমের আঁটি পিছলে মাটিতে পড়ে গেল আর বাচ্চা তার কোলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে রইল। আমের হলুদ রস তখন পর্যন্ত তার কোমল ঠোঁটের উপর লেগে ছিল আর তার কচি কচি হাত দিয়ে সে জঞ্জাল-বুড়োর বুড়ো আঙুল খুব জোরে ধরে রেখেছিল।

একমুহূর্তের জন্য জঞ্জাল-বুড়োর মনে চিন্তা এল যে, বাচ্চাটাকে এখানে ফেলে দিয়ে কোথাও পালিয়ে যায়। ধীরে ধীরে জঞ্জাল-বুড়ো বাচ্চাটার হাত থেকে নিজের বুড়ো আঙুল ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু বাচ্চা খুব জোরে ধরে রেখেছিল। জঞ্জাল-বুড়োর মনে হল, জীবন তাকে ফের ধরে ফেলেছে আর ধীরে ধীরে ধাক্কা দিয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আসছে। হঠাৎ তার দুলারীর কথা মনে পড়ল। আর মনে পড়ল সেই বাচ্চার কথা যে দুলারীর গর্ভেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর হঠাৎই জঞ্জাল-বুড়ো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। মনে হল, আজ সমুদ্র-জলে এত বুদ্‌বুদ্‌ নেই যা তার চোখের জলে ছিল। গত পঁচিশ বছরে যত ময়লা আর নোংরা তার মনে জমে ছিল, আজ তা অশ্রুর তুফানে এক ধাক্কায় সাফ হয়ে গেল।

সারারাত জঞ্জাল-বুড়ো ঐ নবজাত শিশুকে নিজের কোলে নিয়ে অস্থির ও অশান্ত হয়ে ফুটপাতে পায়চারি করল। যখন সকাল হল আর সূর্যের আলো দেখা দিল তখন লোকে দেখল জঞ্জাল-বুড়ো আজ জঞ্জালের টবের কাছাকাছি বসে নেই, উপরন্তু পথের ধারে তৈরি-হওয়া ইমারতের নিচে ইট বইছে, আর এই ইমারতের কাছে এক কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ফুলের নকশাওলা কাপড়ে শুয়ে এক ছোট্ট শিশু মুখে দুধের চুষিকাঠি নিয়ে হাসছে।

জ্যাক লন্ডন

এক টুকরো মাংস

পাঁউরুটির শেষ টুকরোটা দিয়ে প্লেট থেকে ময়দার তরকারির অবশিষ্টটুকু চেঁছেপুঁছে তুলে নিল টম কিঙ। টুকরোটাকে মুখে পুরে ধীরেসুস্থে চিন্তামগ্নভাবে চিবোতে শুরু করল। খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে ওঠার পরেও মনে হচ্ছে তার খিদেটা মেটেনি। তবু তো বাড়ির মধ্যে ও একাই আজ খেয়েছে। ছেলেদুটোকে আগেভাগে ঘুম পাড়িয়ে পাশের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ওরা খেতে পায়নি বলে চেঁচামেচি না করে। টমের স্ত্রী মুখে কিছু ঠেকায়নি। চেয়ারে বসে স্নেহভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। শ্রমিকঘরের মেয়ে টমের বৌ। শুকনো রোগা চেহারা কিন্তু তবু মুখ থেকে লাবণ্যটুকু এখনো পুরো মুছে যায়নি। তরকারির জন্যে ময়দাটা সে প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে এনেছিল। শেষ পুঁজি দুটো আধ-পেনি খরচ হয়েছে পাঁউরুটি কিনতে।

জানালার পাশে রাখা একটা অতি রুগ্‌ণ চেয়ারের উপর বসামাত্র চেয়ারটা টমের ভারের প্রতিবাদে কঁকিয়ে উঠল। মেশিনের মতো অভ্যাসবশত পাইপটা মুখে গুঁজে কোটের পাশ-পকেটে হাত পুরে দিল টম। পকেটে তামাক না-পেয়ে তার হুঁশ ফিরল। নিজের ভুলোমনের কথা ভেবে ভুরু কুঁচকে পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে নিল সে। ওর নড়াচড়ার ব্যাপারটাই কেমন মন্থর। যেন নিজের পেশির ভারে নিজেই কাবু। পাথরের চাঁইয়ের মতো বিশাল দেহের অধিকারী টম কিঙ। শস্তা কাপড়ের ঢলঢলে প্যান্ট-শার্টগুলো বহুদিনের পুরনো। জুতোর তলায় অনেক দিন আগেই সুকতলা মারা হয়েছে, উপরের চামড়াও ছিঁড়ব-ছিঁড়ব করছে। দু শিলিঙ দামের সুতির শার্টের কলারটা ফাটা। সারা জামাময় রঙের দাগ। কাচলেও উঠবে না।

কিন্তু এ সবই গৌণ। টম কিঙের সত্যিকার পরিচয় পেতে হলে ওর মুখের দিকে তাকাতে হবে। তাহলেই নিঃসন্দেহে বলা যাবে ও একজন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। চারচৌকো দড়ি-বাঁধা রিঙের মধ্যে জীবনের শেষ কিছু বছর সে পার করেছে আর তারই দৌলতে তার মুখখানা আজ যোদ্ধা পশুর মতোই চিহ্নিত।

সত্যি মুখখানা দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা। তার ওপর আবার পরিষ্কার করে দাড়ি কামানোর জন্যে মুখের প্রতিটি রেখা যেন আরো কুৎসিতভাবে আত্মপ্রচার করছে। মুখের মধ্যে একটা গভীর ক্ষতচিহ্নের মতো কদাকার ঠোঁটদুটো থেকে যেন মাত্রাতিরিক্ত রুক্ষতা ঝরে পড়ছে। ভারী ভারী চোয়ালদুটোয় পাশবিক একটা আক্রোশ জমে আছে। লোমশ ভুরুর তলায় অলস মন্থর ভাবাবেগহীন দুটো চোখ। নিছক পশু হিসেবে শনাক্ত করার পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক ওর অনুভূতিশূন্য চোখদুটো। নিদ্রাতুর চোখদুটো যেন সিংহের মতো—শিকারি জন্তুর যেমন হয়। কপালের দিকটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে। কদমছাঁট চুলের তলায় এবড়োথেবড়ো মাথাটা পাক্কা বদমাইশের মতো দেখায়। নাকটা দু'বার ভেঙেছে আর অসংখ্য আঘাতে যথেচ্ছ একটা আকার নিয়েছে। কানদুটো আকারে দ্বিগুণ হয়ে ঠিক ফুলকপির মতো ফুলে আছে। এত অলঙ্কারের পর আবার সদ্য-কামানো মুখে দাড়ির আভাস একটা নীলচে কালো ছোপ ফেলেছে।

মোটের ওপর অন্ধকার গলিতে বা নির্জন জায়গায় হঠাৎ ওর মুখোমুখি হলে যে-কেউ ভয় পেতে পারে। কিন্তু তবু টম কিঙ অপরাধী নয়। আজ অবধি কোনো অপরাধই সে করেনি। দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত মামুলি ঝগড়াঝাঁটির কথা বাদ দিলে কারুর কোনো অনিষ্ট করেনি সে। গায়ে-পড়ে ঝগড়া করাটাও তার স্বভাবে নেই। ও পেশাদার বক্সার। কাজেই ওর চরিত্রের পাশবিক অংশটুকু পেশাদার লড়াইয়ের মঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রিঙের বাইরে টম কিঙ শাদাসিধে মানুষ, কারুর সাতে-পাঁচে নেই। অল্পবয়সে যখন প্রচুর রোজগার করেছে, নিজের ভালোমন্দ বিচার না করেই পাঁচজনের জন্যে অঢেল করেছে। কারুর ওপর ওর যেমন কোনো বিদ্বেষ নেই, তেমনি ওরও কোনো শত্রু নেই বললেই চলে। লড়াইটা ওর কাছে একটা ব্যবসা। রিঙের মধ্যে ও আঘাত হানে যখন, ধ্বংস করবার জন্যেই হানে। বাকরুদ্ধ করবার জন্যেই হানে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কাজ করে না। এটা শাদাসিধে লেনদেনের ব্যাপার। লোকে যে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে খেলা দেখতে হাজির হয় সে তো একজন আরেকজনকে গায়ের জোরে হারিয়ে দিচ্ছে দেখবার জন্যেই। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে টম লড়তে নেমেছিল উলুজুলু গজারের বিরুদ্ধে। তার মাত্র চার মাস আগে নিউ ক্যাসেলের লড়াইয়ে গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। সব জেনেশুনেই টম ওর ভাঙা চোয়ালটাকেই তার আক্রমণের লক্ষ্য করে নবম রাউন্ডে আবার গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, গজারের ওপর তার বিশেষ কোনো রাগ ছিল। লড়াইয়ে জেতবার এইটাই ছিল সহজ উপায়। না-জিতলে টাকা আসবে কোত্থেকে! গজারও এর জন্যে টমের ওপর আদৌ বিরূপ হয়নি। এইটাই তো খেলা আর খেলতে যখন ওরা নামে তখন নিয়ম জেনেই নামে।

টম কিন্তু কোনোদিনই বেশি কথার মানুষ নয়। জানলার ধারে বসে বিষণ্ন দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে ছিল হাতদুটোর দিকে। হাতের উলটোপিঠে শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে আছে। আঙুলের গাঁটগুলো বারবার চোট খেয়ে থেঁতলে যে বিশ্রী আকার ধারণ করেছে তার থেকেই বোঝা যায় এগুলোকে কোন্ কাজে লাগানো হয়েছে। শিরা-উপশিরার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের কথা টম কিঙ জানে না কিন্তু কেন ওগুলো অমন ফুলে উঠেছে সেটা জানে। ওর হৃৎপিণ্ড বারংবার উচ্চচাপে এবং অত্যধিক মাত্রায় রক্ত সরবরাহ করেছে শিরাগুলোয়। দীর্ঘদিন এই ঘটনা ঘটতে থাকায় শিরাগুলো এখন আর কোনো সময়েই সাধারণ আকার ধারণ করে না। শিরার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে টমের সহ্যক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। এখন ও অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ও এখন আর আগের মতো কুড়ি রাউন্ডের লড়াই চালাতে পারে না। এক রাউন্ডের পর আর এক রাউন্ড, ঢঙ ঢঙ ঘণ্টাধ্বনি, ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড লড়াই, লড়াই আর লড়াই, মারের বদলা মার, দড়ির উপর আছড়ে পড়া ও প্রতিপক্ষকে আছড়ে ফেলা, আর ওস্তাদের শেষ মার দিতে শেষ রাউন্ডে দর্শকদের কানফাটা চিৎকারের মধ্যে বারবার ছুটে যাওয়া, বারবার ঘুসির বন্যা বওয়ানো, বারবার মাথা নুইয়ে আঘাত বাঁচানো। কিন্তু এর জন্য তখন তার বইয়ে দেওয়া বিশ্বস্ত হৃৎপিণ্ড সবল ধমনি দিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাজা রক্তের বন্যা বওয়াত। সেই মুহূর্তে স্ফীত হয়ে উঠত প্রতিটি ধমনি। আবার প্রয়োজন ফুরোলে আগের আকার ধারণ করত। পুরোপরি আগের আকার ফিরে পেত বলা ভুল, কারণ যত সামান্যই হোক, দৃষ্টিতে ধরা না-পড়ুক, শিরাগুলো কিন্তু প্রতিবারই একটু একটু করে আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিরাফোলা থেঁতলানো হাতের দিক চেয়ে টমের মনে পড়ে যায় তার তরুণ বয়সের সাফল্যের কথা। 'ওয়েল্‌শের আতঙ্ক' নামে পরিচিত বেনি জোন্‌সের মাথায় ঘুসি চালিয়ে সেই প্রথম ওর আঙুলের গাঁট থেঁতলে গেছিল।

খিদেটা আবার মাথা চাগাড় দেয়।

'ব্লিমি, এক টুকরো মাংসের ব্যবস্থা করা যায় না?' হাতের বিরাট মুঠোটা পাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল টম। তারপর চাপা-গলায় একটা অশালীন মন্তব্য করল।

'বার্ক আর সলির ওখানে দু-জায়গাতেই চেষ্টা করেছি।' প্রায় ক্ষমাপ্রার্থীর মতো বলল ব্লিমি।

'দিল না?'

'আধ পেনিও না। বার্ক বলল—' ব্লিমির কথা আটকে যায়।

'থামলে কেন, বলো কী বলেছে?' প্রায় হুমকি দেয় টম।

'বলছিল স্যান্ডেলের সঙ্গে আজ রাত্তিরে তোমার লড়াইয়ের কথা জানে কিন্তু...তাছাড়া ইতিমধ্যেই অনেক বাকি পড়ে গেছে।'

টমের মুখ থেকে একটা বিরক্তিসূচক ধ্বনি ছাড়া আর কোনো কথা শোনা যায় না। মনে পড়ে যায়, পোষা বুলটেরিয়ার কুকুরটাকে একদিন ও একনাগাড়ে মাংস খাইয়েছে। বার্কও তখন নিশ্চয় যত চায় তত ধার দিতে বিন্দুমাত্র গররাজি হত না। কিন্তু জমানা বদলে গেছে। টম কিঙের এখন বয়স হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাব আয়োজিত মুষ্টিযুদ্ধের আসরে নেমে কোনো প্রৌঢ় মুষ্টিযোদ্ধা কখনো দোকানির কাছ থেকে বেশি ধার আশা করতে পারে না।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে ওঠা অবধি একটু মাংস খাবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে রয়েছে। আজকের লড়াইয়ের জন্যে উপযুক্ত ট্রেনিঙের সুযোগ পায়নি টম। অনাবৃষ্টির দরুন এ-বছর অস্ট্রেলিয়ায় যে-কোনো ধরনের একটা সাময়িক কাজ জোগাড় করাও শক্ত হয়ে পড়েছে। প্র্যাকটিস করার মতো সহকারী অবধি নেই টমের। ভালো খাবার তো দূরের কথা, সবসময় পেটভরা খাবারও জোটেনি। যখন যেমন সুযোগ পেয়েছে দু-একদিন করে মাটি কাটার কাজ করেছে আর প্রতিদিন ভোরবেলা নিয়ম করে দৌড়েছে যাতে পায়ের জোর না হারায়। তবু দুটো নাবালক সন্তান ও স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার পর একা একা সঙ্গী-বিনা প্র্যাকটিস করা দুরূহ কাজ। স্যান্ডেলের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা হবার পরেও দোকানিদের কাছে কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়নি। শুধু 'গেইটি' ক্লাবের সেক্রেটারি তাকে তিন পাউন্ড দিয়েছিলেন। লড়াইয়ে হারলেও এই তিন পাউন্ড তার পাবার কথা। সেইজন্যেই তিন পাউন্ডের বেশি ধার হিসেবে দিতে সেক্রেটারি রাজি হননি। পুরনো বন্ধুদের কাছ থেকে মাঝেমাঝে দু-চার শিলিঙ চেয়ে-চিন্তে এনেছে, এ-বছর খরা না হলে তারা নিশ্চয় আরো বেশি দিতে পারত। স্বীকার না-করে উপায় নেই যে, সত্যিই ওর ঠিকমতো ট্রেনিঙ হয়নি। আরো ভালো খাওয়াদাওয়ার প্রয়োজন ছিল, সব দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া চল্লিশ বছর বয়সে একজনকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে হলে যে কষ্ট পোয়াতে হয়, বিশ বছরের তরুণকে নিশ্চয় তা হয় না।

'কটা বাজল লিজি?' টম জিগ্যেস করল।

লিজি উঠে গিয়ে পাশের বাড়ির লোকের কাছ থেকে সময় জেনে এল। 'আটটা বাজতে পনেরো।'

'আর দু'চার মিনিটের মধ্যেই প্রথম খেলাটা শুরু হবে। তবে ওটা শুধু যাচাই করে দেখার জন্যে। এরপর হবে ডিলার ওয়েল্‌শ আর গ্রিডলি'র চার রাউন্ডের খেলা। তারপর স্টারলাইট আর একটা নাবিকের মধ্যে দশ রাউন্ড। কাজেই ঘণ্টাখানেকের আগে আমার ডাক পড়বে না।'

আরো মিনিট দশেক মুখ বুজিয়ে কাটিয়ে দিয়ে টম উঠে দাঁড়াল।

'আসলে কী জানো লিজি, আমি একেবারেই প্র্যাকটিসের সুযোগ পাইনি।'

টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায় টম। লিজিকে চুমু খাবার কোনো ইচ্ছে প্রকাশ পায় না। এটা টমের চিরকালের স্বভাব। বেরোবার মুখে কোনোদিন চুমু খায় না। আজ লিজি কিন্তু দু'হাতে টমের গলা জড়িয়ে ধরে প্রায় জোর করে ওর মাথা নুইয়ে চুমু খেল। বিশাল চেহারার টমের পাশে লিজিকে যেন পুতুলের মতো দেখায়।

'গুড লাক্ টম। জিততে হবেই কিন্তু—' লিজি বলল।

'হ্যাঁ, জিততে হবেই।' ফের একই কথা বলে টম। 'এটাই এখন একমাত্র কাজ—জেতা—জিততেই হবে।'

টম হেসে উঠে খুশি হবার ভাব দেখাতে চায়। লিজি ওকে আরো জড়িয়ে ধরে। লিজির কাঁধের উপর দিয়ে তাকায় টম। আসবাবহীন ফাঁকা একটা ঘর। টমের নিজের বলতে আছে এই ঘরখানা, লিজি আর তার দুই সন্তান। তা-ও বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে। সঙ্গিনী আর ছানাদের খাদ্যসংস্থানের জন্যে এই আস্তানা ছেড়ে নিশুতি রাতে অভিযানে বেরোতে হচ্ছে টমকে। বর্তমান যুগের কলকারখানার মজুররাও যন্ত্রের মধ্যে নিজেদের পেষাই করে খাদ্যসংস্থানের জন্যে। কিন্তু টমের পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই প্রাচীন আদিম রাজকীয় ভঙ্গিতে বন্যপশুর মতো লড়াই করে ও খাদ্য সংগ্রহ করছে।

'হারাতেই হবে—হারাতেই হবে—' টম মরিয়া হয়ে উঠেছে বোঝা যায়। 'জিততে পারলেই তিরিশ ডলার। সব ধার শোধ হয়েও কিছু থেকে যাবে। হারলে একটি কানাকড়িও পাব না। ট্রামে চড়ার পয়সা অবধি নেই। হেঁটে ফিরতে হবে। চলি তাহলে—জিততে যদি পারি সিধে ফিরে আসব বাড়িতে।'

'আমি জেগে থাকব—' টমের পেছন থেকে গলা চড়িয়ে বলল লিজি।

পুরো দু'মাইল হেঁটে গেইটিতে পৌঁছতে হবে। টমের মনে পড়ে যায়, একদিন সে নিউ সাউথ ওয়েল্‌শের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিল। তখন ট্যাক্সি ছাড়া লড়াইয়ের আসরে যাবার কথা ভাবাই যেত না। তাছাড়া টম জিতবে বলে যারা জব্বর বাজি ধরত, তাদের মধ্যে কেউ-না-কেউ সঙ্গেই থাকত। টমি বার্নস ছিল—ইয়াঙ্কি জ্যাক জনসন ছিল—ওরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসত।

টম হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে। সবাই জানে বক্সিঙের আগে দু'মাইল পথ হাঁটা কোনো কাজের কথা নয়। টমের বয়স হয়ে গেছে আর বয়স্ক লোকদের ওপর পৃথিবী বড়ই বিরূপ। এখন মাটি কাটার কাজ ছাড়া ওর আর কিছুই মানায় না, কিন্তু সেখানেও ওর এই ভাঙা নাক আর স্ফীতকায় কানদুটো প্রতিবন্ধক। টম ভাবে, কী কুক্ষণেই-না সে কোনো হাতের কাজ শেখেনি। শিখত যদি, শেষপর্যন্ত কাজেই লাগত। কিন্তু সে-কথা কেউ তাকে বলেনি। অবশ্য বললেও উপদেশ কানে নিত না টম। সেদিন পুরো ছবিটাই ছিল রঙিন। সহজলভ্য অর্থ—তীব্র গৌরবময় লড়াই—

দুই লড়াইয়ের মাঝে অফুরন্ত অবসর—উন্মাদ সমর্থকদের ভিড়—পিঠ চাপড়ানি—করমর্দন—পাঁচ মিনিট কথা বলার জন্যে ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ—লড়াইয়ের আসরের হর্ষধ্বনি—লড়াইয়ের অন্তিমে ঝড়ের মতো আঘাত-বর্ষণ আর রেফ্‌রির ঘোষণা—'কিঙের জিত!' পরের দিন সকালে খবরের কাগজের খেলার পাতায় নাম।

সেসব দিনের কথাই ছিল আলাদা। এখন কিন্তু টম ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে যে, সে শুধু পুরনোদেরই সেদিন বাতিল করে দিয়েছে। উঠতি যৌবন হিসেবে প্রবীণদের তলায় টেনে নামিয়ে দিয়েছে। কাজেই অবাক হবার কিছু নেই যে, কাজ হাসিল করতে তাকে কোনো বেগ পেতে হয়নি। তাদের সকলেরই ছিল স্ফীতকায় হাতের শিরা, থেঁতলানো আঙুলের গাঁট আর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত দেহ—বৃদ্ধ যোদ্ধা। রাশে কাটার্‌স্ বে'র লড়াইয়ে অষ্টাদশ রাউন্ডে প্রবীণ স্টাউশার বিল্‌কে হারাবার কথা মনে পড়ে যায় টমের। লড়াইয়ের পর ড্রেসিংরুমে বসে শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েছিল বিল। হয়তো বিলেরও বাড়িভাড়া বাকি পড়েছিল। হয়তো তারও বাড়িতে ছিল বৌ আর ছেলেমেয়ে। হয়তো সেদিন লড়াইয়ের আগে বিলও একটুকরো মাংস খাবার জন্যে আকুল হয়েছিল। বিল সেদিন লড়াইয়ের আসরে নিদারুণ প্রহার খেয়েছিল। আজ টম বুঝতে পারছে যে কুড়ি বছর আগে সেই দিনটিতে বিল তার চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লড়াইয়ের আসরে নেমেছিল। টমের মতো সে শুধু খ্যাতি আর সহজলভ্য অর্থ কুড়োতে আসেনি। তাই হেরে যাবার পর বিলের কান্নাটাও খুবই স্বাভাবিক।

একটা মানুষের লড়াইয়ের ক্ষমতা সীমিত। এর কোনো ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। কেউ একশোটা লড়াইয়ের পর ফুরিয়ে যায়, আবার কেউ মাত্র কুড়িটার পরই শেষ। সবটাই নির্ভর করে মানুষটার দৈহিক গঠনের ওপর, তার পেশির তন্ত্রীগুলোর উৎকর্ষের ওপর। নির্ধারিত সংখ্যক লড়াইয়ের পর তাই কারুর পক্ষেই আর কিছু করা সম্ভব নয়। বড় কঠোর এই প্রাকৃতিক বিধান। আর-পাঁচজনের চেয়ে টমের ক্ষমতা বেশিই ছিল বলতে হবে। সেই ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে লড়াইয়ের-পর-লড়াইয়ে। জান-প্রাণ উজাড় করে লড়াই—হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস ফাটিয়ে—ধমনিকে স্ফীত করে। এইজন্যেই যৌবনের নমনীয় মাংসপেশিগুলো দড়ির মতো গাঁট পাকিয়ে গেছে। স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। সহ্যশক্তি কমে এসেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে দেহ-মন ঝিমিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, আর-পাঁচজনের তুলনায় টম অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। তার পুরনো মুষ্টিযোদ্ধা-বন্ধুদের কেউই আর টিকে নেই। এক-এক করে সবাই বিদায় নিয়েছে আর তাদের সেই বিদায়ের আয়োজনে টমও অনেক সময় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রবীণদের বিরুদ্ধে তাকে লড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আর টমও এক-এক করে সবাইকে অপসারিত করে গেছে। স্টাউশার বিলের মতো কেউ যখন ড্রেসিংরুমে

বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছে, ও তখন হেসেছে। এখন টম নিজে প্রবীণদের দলভুক্ত। তার বিরুদ্ধে তাই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে নবীনদের। আজকের এই স্যান্ডেল ছোকরাটা এসেছে নিউজিল্যান্ড থেকে। সেখানে নাকি নামও কিনেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় কেউ তার সম্বন্ধে কিছু জানে না বলেই টমের সঙ্গে এই বক্সিঙের আয়োজন। স্যান্ডেল যদি আজ তাগদ দেখাতে পারে তাহলে আরো নামকরা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ার, আরো বেশি অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পাবে। কাজেই স্যান্ডেল আজ জেতবার জন্যে চেষ্টার কসুর করবে না। অর্থ, খ্যাতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হাতছানি দিচ্ছে স্যান্ডেলকে। সৌভাগ্য আর স্যান্ডেলের মাঝে বাধা বলতে এখন শুধু আছে পুরনো ঘাঘু টম কিঙ। যে টমের পাওনা খুব বেশি হলে তিরিশটা মাত্র ডলার। বাড়িওলা আর দোকানির ধার শোধ করতেই যা খরচ হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতেই একসময় টমের চোখের সামনে তারুণ্য যেন রক্তমাংসের রূপ ধারণ করে। তারুণ্য—মহান তারুণ্য—অজেয় আর উৎফুল্ল—উজ্জীবিত পেশি ও গায়ের রেশম-কোমল চামড়া—অক্লান্ত অবিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস। যে তারুণ্য শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব দেখলেই ফেটে পড়ে হাসিতে। তারুণ্যই বিধ্বংসের দেবতা। পুরনোকে সে ধ্বংস করে আর তার সঙ্গে নিজেকেও তিল তিল করে খুইয়ে ফেলে। ক্রমশ তারও ধমনি আকারে বৃদ্ধি পায়, আঙুলের গাঁটগুলো যায় থেঁতলে এবং একদিন সে-ও পড়ে যায় পুরনো বাতিলদের দলে। কারণ তরুণ যা—তা চিরতরুণই থাকে, শুধু যুগটাই-যা পাল্টে যায়।

ক্যাসেলরিগ স্ট্রিটে পা দিয়ে বাঁ-দিকে মোড় নিল টম। তিনটে বাড়ির পরেই গেইটি। একদঙ্গল ছোকরা প্রবেশপথের মুখেই ভিড় জমিয়ে ছিল। ওকে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। টম শুনতে পেল ওরা বলাবলি করছে—টম কিঙ! এই তো টম কিঙ!

ড্রেসিংরুমে ঢুকবার আগেই ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা। যুবকটির চোখেমুখে ধূর্ততার ছাপ। করমর্দন করে বলল, 'কেমন লাগছে বলুন?'

'চমৎকার! পুরোপুরি ফিট্।' টম জেনেশুনে ডাহা মিথ্যে কথাটা বলল। পয়সা থাকলে এখুনি ও একটু মাংস খাবার ব্যবস্থা করত।

ড্রেসিংরুম ছেড়ে বারান্দা পেরিয়ে হলঘরের মাঝে চৌকো রিঙের কাছে এসে দাঁড়াতেই অপেক্ষারত জনতা হর্ষধ্বনি করে আপ্যায়ন জানাল। একবার ডানদিকে আর একবার বাঁ-দিকে ফিরে টমও অভিবাদনে সাড়া দিল। বলতে গেলে সবই অচেনা মুখ। বেশিরভাগই কিশোর। টম যখন প্রথম নাম করেছে তখন এদের অনেকেই বোধহয় জন্মায়ওনি। উঁচু মঞ্চটার উপর একলাফে উঠে এল টম। ঘাড় নুইয়ে দড়ির তলা দিয়ে ঢুকে এককোণে নিজের জায়গায় চলে এল। ফোল্ডিং টুলের উপর বসল। রেফ্‌রি জ্যাক বল্ এগিয়ে এসে করমর্দন করল। বল্‌ও

এককালের পেশাদার বক্সার। অবশ্য দশ বছর আগেই সে লড়াই ছেড়ে দিয়েছে। বল্‌কে রেফ্‌রি দেখে কিঙ খুশি হয়। পুরনোদিনের লোক বল্। স্যান্ডেলকে একটু বেআইনিভাবে মারধোর করলেও বল্ সেদিকে নজর দেবে না।

এক-এক করে ভাবী হেভিওয়েট বক্সাররা রিঙে উঠছে আর রেফ্‌রি তাদের পরিচয় পেশ করছে। তাছাড়া তারা প্রত্যেকেই বাজি ধরছে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে।

বল্ ঘোষণা করল, 'নর্থ সিডনির বক্সার প্রন্টো আজকের লড়াইয়ের বিজয়ীকে পঞ্চাশ পাউন্ড বাজি ধরে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।'

স্যান্ডেল রিঙের মধ্যে লাফিয়ে উঠতেই দর্শকরা বারবার হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। নিজের জায়গায় গিয়ে বসল স্যান্ডেল। রিঙের বিপরীত কোণ থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল টম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা দুজনে নির্দয় সংগ্রামে জড়িয়ে পড়বে। বিপক্ষকে আঘাতে আঘাতে অচৈতন্য আর ধরাশায়ী করার জন্যে তারা প্রত্যেকেই তাদের দেহের শেষবিন্দু শক্তিকেও উজাড় করে দেবে। কিন্তু স্যান্ডেলও টমের মতো রিঙ কস্টিউমের উপর সোয়েটার আর ট্রাউজার চড়িয়ে রেখেছে, তাই দেখে বিশেষ কিছু বুঝবার উপায় নেই। সুদর্শন মুখশ্রী—মাথাভর্তি কোঁকড়া ঘন হলদে-রঙা চুল। সুপুষ্ট পেশিবহুল ঘাড়টাই তার শক্তিমত্তার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তরুণ প্রন্টো রিঙের দু-প্রান্তে গিয়ে স্যান্ডেল আর টমের সঙ্গে করমর্দন সেরে নেমে গেল। একের-পর-এক তরুণ মুষ্টিযোদ্ধারা উঠে আসছে আর তাদের লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এই মুখগুলো সবারই অপরিচিত কিন্তু যৌবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তারা সরব—দুনিয়ার মানুষের সামনে তাদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ—শক্তি আর নিপুণতার জোরে তারা আজকের বিজয়ী যোদ্ধাকে আগামীদিনে পরাস্ত করবেই করবে। আগে হলে টম কিঙ মজা পেত, হয়তো বিরক্তিও বোধ করত। লড়াইয়ের আগে এইসব অনুষ্ঠান দেখে এখন কিন্তু আগ্রহই বোধ করছে সে—অজেয় যৌবনকে প্রত্যক্ষ করছে। যৌবন চিরকালই ঠিক এইভাবে দড়ি গলে লাফিয়ে উঠেছে রিঙের ভেতর, উপেক্ষা-ভরে ছুড়ে দিয়েছে উদ্ধত চ্যালেঞ্জ আর বার্ধক্যও চিরকাল নত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে হার। বৃদ্ধ যোদ্ধাদের মাড়িয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে যায় তরুণরা। অতৃপ্ত অপ্রতিরোধী তরুণের স্রোত বৃদ্ধদের দেয় ভাসিয়ে। তারপর একদিনের তরুণরাও বৃদ্ধ হয়, তারাও আবার সেই একই পতনের পথের পথিক হয়। চিরজয়ী শাশ্বত তারুণ্য।

প্রেসবক্সের দিকে তাকিয়ে টম কিঙ 'স্পোর্টসম্যান্' কাগজের মরগ্যান, আর 'রেফ্‌রি' কাগজের করবেটকে দেখতে পেয়ে ঘাড় নাড়ল। টম এবার দু'হাত উঁচু করে ধরতেই তার সহকারী সিড সুলিভান ও চার্লি বেট্‌স গ্লাভস পরিয়ে দিয়ে শক্ত করে ফিতে বেঁধে দিল। স্যান্ডেলের একজন সহকারী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সন্দিগ্ধ

দৃষ্টিতে পরখ করছিল টমের আঙুলের গাঁটের উপরকার ছোট ছোট ব্যান্ডেজগুলো। ওদিকে টমের একজন সহকারী স্যান্ডেলের কাছে দাঁড়িয়ে একইভাবেই নজর রাখছে। স্যান্ডেলের প্যান্টটা টেনে খুলে নিতেই সে উঠে দাঁড়াল। এবার সোয়েটারটা টেনে তুলে নেওয়া হল মাথা গলিয়ে। টম দ্যাখে তারুণ্য মানুষের রূপ ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুস্থ-সবল দেহের চামড়ার নিচে মাংসপেশিগুলো জীবন্ত প্রাণীর মতো খেলা করছে। সারা শরীর জুড়ে শুধু চঞ্চল প্রাণের স্বাক্ষর। টম জানে ওর এই সতেজ প্রাণের নির্যাসের একবিন্দুও এখনো অসংখ্য আঘাতজনিত ক্ষতমুখ দিয়ে ঝরে পড়েনি। লড়াইয়ের-পর-লড়াইয়ে তার তারুণ্য এখনো খেসারত দিতে শুরু করেনি।

ওরা দু'জন এবার এগিয়ে আসে মঞ্চের মাঝখানে। ঘণ্টা পড়তেই সহকারীরা ভাঁজ-করা চেয়ারদুটো তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। স্যান্ডেল আর টম করমর্দন সারা-মাত্র ওদের দেহদুটো যোদ্ধার ভঙ্গি গ্রহণ করল। সূক্ষ্ম কেশের বাঁধন ছিঁড়ে ইস্পাত আর স্প্রিঙে গড়া যন্ত্রের মতো ছটফট করে উঠল স্যান্ডেল। একবার এগিয়ে, একবার পিছিয়ে বাঁ হাতের ঘুসি মারল চোখে, ডান হাতের ঘুসি পাঁজরে, তারপর টমের প্রত্যাঘাত এড়িয়ে লঘুপায়ে নেচে পিছিয়ে এসেও ফের এগিয়ে এল হিংস্র হয়ে। স্যান্ডেল অত্যন্ত তৎপর আর চতুর। চোখ-ধাঁধানো প্রদর্শনী। দর্শকরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। টমের কিন্তু ঠাণ্ডা মাথা। অভিজ্ঞ যোদ্ধা টম এমন ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে কতবার যে লড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। স্যান্ডেলের ঘুসিগুলোর সঠিক মূল্য তার জানা। এই ত্বরিত আক্রমণ মারাত্মক নয়। জানা কথা, স্যান্ডেল প্রথম থেকেই হুটোপাটি করবে। এটা যৌবনের ধর্ম। বিদ্রোহে উন্মাদ। অফুরন্ত ক্ষমতা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে যৌবনের দর্পে ফেটে পড়ে। ক্রুদ্ধ আক্রমণে বিপর্যস্ত করে দেয় প্রতিপক্ষকে।

স্যান্ডেল একবার এগোচ্ছে, একবার পেছাচ্ছে। একবার এখানে, একবার ওখানে। উদ্দীপনা যেন চঞ্চলপায়ে চষে ফেলছে সারা মঞ্চটা। শাদা চামড়া আর মাংশপেশির আশ্চর্য মহিমা! দেহটা যেন মাকুর মতো উঠছে লাফাচ্ছে, পিছলে বেরিয়ে আসছে আর রচনা করছে আক্রমণের এক চোখ-ধাঁধানো জাল। আক্রমণের-পর-আক্রমণ—হাজারো আক্রমণ, কিন্তু লক্ষ্য একটাই—টম কিঙকে ধ্বংস করা। টম কিঙ যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যান্ডেল আর তার সাফল্যের মাঝখানে। টম অত্যন্ত সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে যায় আঘাতগুলো। সে তার করণীয় সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। টম যৌবন পার করে এসেছে, তাই যৌবনকে চিনতে তার আর বাকি নেই। যতক্ষণ-না স্যান্ডেলের খানিকটা দম বেরোচ্ছে কিছু করবার নেই। টম ইচ্ছে করে মাথা নুইয়ে একটা ঘুসি খেল মাথায়। দাঁতে দাঁত টিপে হাসে টম। শয়তানি করেছে ঠিকই কিন্তু খেলার নিয়ম

ভঙ্গ করেনি। নিজের হাতের আঙুলের গাঁট বাঁচাবার দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজের। তারপরেও কেউ যদি কারুর মাথার উপর ঘুসি কষাতে চায়, নিজের ক্ষতি করে—কেউ বাধা দেবে না। টম ইচ্ছে করলে মাথাটা আরেকটু নিচু করতে পারত, তাহলেই ঘুসিটা ফস্কে যেত। টম তা করেনি কারণ তার মনে পড়ে গিয়েছিল প্রথমজীবনের লড়াইয়ের কথা। মনে পড়ে গেছল 'ওয়েল্‌শের আতঙ্ক'-এর মাথায় সেই প্রথমবার আঙুলের গাঁট থেঁতলে যাবার কথা। মাথাটা পুরোপুরি নিচু না-করার জন্যে স্যান্ডেলেরও আঙুলের একটা গাঁট খতম হয়ে গেছে। অবশ্য এই নিয়ে স্যান্ডেল এখন মাথাও ঘামাবে না। কোনো ভ্রুক্ষেপ না করেই সে এমনি বীরদর্পে আঘাতের-পর-আঘাত হেনে যাবে লড়াইয়ের শেষমুহূর্ত অবধি। কিন্তু একদিন আসবেই যখন একের-পর-এক লড়াইয়ে নামার ফল ফলতে শুরু করবে। থেঁতলানো গাঁটগুলোর দিকে তাকিয়ে তখন অনুশোচনা হবে। মনে পড়ে যাবে টম কিঙের মাথায় ঘুসি মেরে প্রথম আঘাত পাবার কথা।

প্রথম রাউন্ডের পুরো সাফল্যটুকু একা কেড়ে নেয় স্যান্ডেল। ঘূর্ণিঝড়ের মতো তার ক্ষিপ্র আক্রমণ উল্লসিত করে প্রতিটি দর্শককে। ঘুসির বন্যায় টমকে দিশেহারা করে দেয়। টম কিছুই করছে না। একবারও পাল্টা ঘুসি চালায়নি। শুধু আঘাত বাঁচাতে নিজেকে আড়াল করেছে, বাধা দিয়েছে, মাথা নামিয়ে নিয়েছে। সরাসরি আঘাত পেয়ে কখনো আবার ভান করেছে যেন মাথা ঘুরে গেছে। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শ্লথভঙ্গিতে সরে এসেছে। একবারও লাফায়নি বা ঝাঁপিয়ে পড়েনি। শরীরের একবিন্দু শক্তিও অপচয় করেনি। স্যান্ডেলের ফেনিল যৌবন সম্পূর্ণভাবে উপচে না-পড়া পর্যন্ত বিচক্ষণ প্রবীণ প্রতিশোধ নিতে সাহস পাবে না। টমের প্রতিটি গতিবিধি মন্থর হলেও সুসংবদ্ধ সুশৃঙ্খল। ওর ক্লান্ত অলস চোখের দৃষ্টি ভ্রম সৃষ্টি করে—মনে হয় ও বুঝি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। আসলে কিন্তু কিছুই ওর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। কুড়ি বছরেরও বেশি দড়ি-ঘেরা মঞ্চের ভেতর কাটানোর সুবাদে তার চোখের নজর তৈরি হয়ে গেছে। আসন্ন আঘাতের আশঙ্কায় চোখের পাতা কাঁপে না বা পড়ে না। শীতল চোখদুটো শুধু চেয়ে থাকে আর দূরত্বের মাপ নেয়।

প্রথম রাউন্ডের পর রিঙের কোণে বসে নির্ধারিত এক মিনিট বিশ্রাম উপভোগ করল টম। পা'দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে—হাতদুটোর ভর রেখেছে পিছনের দড়ির উপর। সহকারীরা তোয়ালে নেড়ে বাতাস করছে আর বুকভরে শ্বাস নিচ্ছে টম। পেট আর বুক ঘনঘন ওঠানামা করছে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে টম। কানে আসছে দর্শকদের নানা প্রশ্ন: 'লড়ছ-না যে টম?'—'তুমি কি ওকে ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'সব পেশি আড়ষ্ট হয়ে গেছে?' সামনের সিট্ থেকে একজনকে মন্তব্য করতে শুনল। 'এর চেয়ে তাড়াতাড়ি নড়তে পারে না। স্যান্ডেলের ওপর নগদ বাজি ধরছি—টু টু ওয়ান।'

ঘণ্টা পড়তেই দু'জনে নিজেদের জায়গা ছেড়ে সামনে এগিয়ে এল। টম যত- না এগোয় স্যান্ডেল তার তিনগুণ। স্বভাবতই স্যান্ডেল ব্যগ্র। টম কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট। এটা তার হিসাবি মনোবৃত্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। টমের ট্রেনিঙ জোটেনি, ভালো করে খাওয়াও হয়নি, কাজেই প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পাক্কা দু'মাইল হেঁটে এসেছে। ঠিক প্রথম রাউন্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবারেও। ঘূর্ণিঝড়ের মতো স্যান্ডেলের আক্রমণ আর নিষ্ক্রিয় টম কিঙ। ক্ষুব্ধ দর্শকরা বারবার জানতে চাইছে—টম কেন লড়ছে না। টম শুধুই ভান করছে। যাও-বা দু-একটা ঘুসি মেরেছে তার পিছনে না-ছিল গতি, না কোনো শক্তি। নিজেকে আড়াল করা আর সরিয়ে নেওয়া ছাড়া কিছুই করেনি সে। স্যান্ডেল চাইছে লড়াইয়ের মধ্যে ক্ষিপ্রতা আনতে, কিন্তু অভিজ্ঞতার জোরে টম তাকে সে-সুযোগ দিচ্ছে না একেবারে। ব্যথাভরা অদ্ভুত এক ধরনের চাপা হাসির আভাস ফুটে উঠেছে টমের আঘাত-জর্জরিত ভাঙাচোরা মুখটায়। এমন ব্যাকুলভাবে নিজের ক্ষমতাকে কয়েদ করে রাখার সামর্থ্য শুধু বয়সের সঙ্গেই আসে। স্যান্ডেল মানেই যৌবন আর যৌবন নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে এমনি অবহেলা ভরেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়। রিঙের অধিনায়ক কিন্তু টম। একের-পর-এক তিক্ত সুদীর্ঘ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুবাদে সে অর্জন করেছে তার বিচক্ষণতা। স্থিরদৃষ্টিতে ঠাণ্ডা মাথায় নজর রাখছে টম। মন্থর পদক্ষেপ। স্যান্ডেলের সফেন যৌবন উপচে না-পড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষাই করবে। অধিকাংশ দর্শকই ভাবে যে, স্যান্ডেলের সঙ্গে টমের কোনো তুলনাই চলতে পারে না। বাজির হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় তিনে এক। এরই মধ্যে কিছু কিছু বিজ্ঞলোকও আছে। এরা আগে টমের লড়াই দেখেছে। তারা টমের ওপরেই বাজি ধরে নিশ্চিন্ত মনে।

যথারীতি তৃতীয় রাউন্ডের শুরু থেকেই স্যান্ডেলের একতরফা আক্রমণ শুরু হয়। তিরিশ সেকেন্ড পেরোবার পর স্যান্ডেলেরই অসাবধানতায় একটা সুযোগ পেয়ে যায় টম। তার চোখ ঝলসে ওঠে আর তারই সঙ্গে ত্বরিত-গতিতে এগিয়ে আসে ডানহাত। এই তার প্রথম মার—পেঁচানো ডান বাহুর কঠিনতা আর আধঘুরন্ত দেহের পুরো ভার সমেত হুক্ করেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন একটা সিংহ যেন আচমকা বাজ পড়ার মতো থাবা বসিয়ে দিয়েছে। আঘাতটা চোয়ালের ধারে লাগা মাত্র গলা-কাটা গরুর মতো লুটিয়ে পড়ল স্যান্ডেল। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে সভয়ে বাহবা জানাল। লোকটা তাহলে একেবারে অচল নয়, ঘুসিটা যা ঝেড়েছে, কামারশালের হাতুড়ির মতো।

স্যান্ডেল হতভম্ব হয়ে গেছে। মেঝের উপর এক পাক গড়িয়ে উঠে বসতে যায় কিন্তু তার সহকারীরা চিৎকার করে বারণ করে দেয় উঠতে। রেফ্‌রির সময় গণা শেষ না-হওয়া অবধি বিশ্রাম নেবার জন্যে উপদেশ দেয়। একটা হাঁটু মুড়ে

তার উপর দেহের ভার রেখে বসে স্যান্ডেল, যাতে যে-কোনো মুহূর্তেই উঠে দাঁড়াতে পারে। রেফরি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এক দুই তিন করে জোরে জোরে গুনে চলে প্রতিটি সেকেন্ড। নয় গোনা হতেই যোদ্ধার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল স্যান্ডেল। টমের আফসোসের অন্ত নেই। ঘুসিটা যদি আর এক ইঞ্চি ওপাশে চোয়ালের ঠিক ভাঁজটায় পড়ত, পুরো নক্-আউট হয়ে যেত স্যান্ডেল। তিরিশটা ডলার পকেটে পুরে সোজা বাড়ি ফিরে যেতে পারত। বৌ আর বাচ্চারা ওরই পথ চেয়ে বসে আছে।

পুরো তিন মিনিট পার করে রাউন্ড শেষ হবে। স্যান্ডেল এবার তার প্রতিপক্ষকে সমীহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। টমের কিন্তু সেই আগের মতোই মন্থর গতি, ঘুম-জড়ানো দৃষ্টি। রিঙের পেছনে সহকারীদের অপেক্ষা করতে দেখেই টম বুঝতে পারে রাউন্ড শেষ হবার সময় হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় সে। লড়াইটাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করে যাতে ক্রমশ সে তার নিজের দিকের কোণটার কাছে এগিয়ে আসতে পারে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে টম তার টুলটার উপর বসে পড়ে। স্যান্ডেলকে ঠিক কোণাকুণিভাবে হেঁটে পুরো মঞ্চটা পার হয়ে নিজের জায়গায় পৌঁছতে হয়। ব্যাপারটা সামান্য কিন্তু এইরকম অনেকগুলো সামান্য ব্যাপার যখন একসঙ্গে দানা বাঁধে তখন আর তা সামান্য থাকে না। ওই ক'পা বেশি হাঁটতে বাধ্য হয়েছে স্যান্ডেল, ওইটুকু শক্তি বেশি খরচ করেছে, বিশ্রামের অত্যন্ত মহার্ঘ এক মিনিট সময়ের থেকেও কয়েক সেকেন্ড খোয়া গেছে। প্রতি রাউন্ডের সূচনায় টম অত্যন্ত মন্থরভাবে অগ্রসর হয়েছে আর স্যান্ডেলকে বেশি করে হাঁটিয়েছে। আবার প্রতিটি রাউন্ডের সমাপ্তির সময় দেখা গেছে চতুর টম ঠিক স্বস্থানে ফিরে এসেছে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছে নিজের টুলে।

আরো দু রাউন্ড খেলা হয়ে গেছে। টম তার শক্তি-ব্যয়ে যতটা কৃপণ, স্যান্ডেল ঠিক ততটাই বেহিসাবি। স্যান্ডেল খেলার গতি বাড়াবার জন্যে সচেষ্ট হলে টম অস্বস্তিতে পড়ে। স্যান্ডেলের অসংখ্য আঘাতের মধ্যে বেশকিছু লক্ষ্যভেদ করেছে। তবু টম তার শ্লথভঙ্গি ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। মাথাগরম ছোকরারা ওদিকে চেঁচিয়ে আসর মাত্ করছে—টমকে লড়তে বলছে। ষষ্ঠ রাউন্ডে স্যান্ডেল আবার অসতর্ক হতেই টমের ডানহাতের ভয়াবহ ঘুসি এসে পড়ে তার চোয়ালে। আবার রেফরি 'নয়' গোনা অবধি পড়ে থাকে সে। সপ্তম রাউন্ডে স্যান্ডেলের অতি-উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে। বুঝতে পারে এটা তার জীবনের কঠিনতম লড়াই। টম কিঙ বুড়ো হতে পারে কিন্তু এ অবধি সে টমের মতো যোদ্ধার সম্মুখীন হয়নি। বুড়ো টম কক্ষনো মাথা গরম করে না, তার আত্মরক্ষার কৌশল নিখুঁত, তার ঘুসির আঘাত যেন মুগুরের ঘা। তাছাড়া তার ডান বাঁ দু'হাতেই নক্-আউট। তা হলেও টম কিন্তু বারবার আঘাত হানতে

সাহস পায় না। আঙুলের ভাঙা গাঁটগুলোর কথা সে ভোলেনি। শেষপর্যন্ত লড়তে হলে খুব বুঝেসুঝে প্রতিটি আঘাত হানা প্রয়োজন। টুলে বসে ওপ্রান্তে স্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে টমের মনে হল, ওর অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্যান্ডেলের যৌবনকে যদি যুক্ত করা যেত, সেটা নিশ্চিতভাবে বিশ্ব-হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নের জন্ম দিত। কিন্তু মুশকিল এই যে স্যান্ডেল কোনোদিনই বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হবে না। সে বিচক্ষণতা তার নেই। একমাত্র তার যৌবনকে বিকিয়েই সে তার অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারে। তারপর একদিন সে বিচক্ষণতা অর্জন করবে ঠিকই, কিন্তু ততদিনে তার যৌবন ফুরিয়ে যাবে।

যতরকমভাবে সম্ভব টম সুযোগ নিতে কসুর করে না। সুবিধে পেলেই সে আঁকড়ে ধরছে বিপক্ষকে। আর আঁকড়ে ধরার মুহূর্তে বলতে গেলে প্রতিবারই তার কাঁধটা স্যান্ডেলের পাঁজরে আঘাত করছে। মুষ্টিযুদ্ধের বিচারে ঘুসির মতোই কার্যকর কাঁধটা। তাছাড়া এতে শক্তির অপচয়ও হয় অপেক্ষাকৃত কম। একবার পাকড়ে ধরতে পারলে টম তার পুরো দেহের ওজনটা ছেড়ে দেয় বিপক্ষের ওপর। দু'জনকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে তখন রেফরির হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। টম যখনই কাঁধ দিয়ে স্যান্ডেলের পাঁজরে গোত্তা মেরে ওকে জাপটে ধরে, ওর মাথাটা থাকে স্যান্ডেলের বাঁ হাতের তলায়। স্যান্ডেল এইরকম সময় তার পিঠের দিক দিয়ে ডানহাত চালিয়ে টমের মুখে আঘাত করে। স্যান্ডেলের এই মারের চাতুর্য দর্শকদের সহর্ষ তারিফ পায় কিন্তু তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। শক্তির অহেতুক অপচয়। স্যান্ডেলের কিন্তু ক্লান্তি নেই, কোনো বিকার নেই। টম মুচকি মুচকি হাসে আর সহ্য করে যায় মারগুলো।

স্যান্ডেল এবার ডানহাতে পরপর ক'বার জোরালো ঘুসি চালায়। দেখে মনে হয় টম দারুণ মার খাচ্ছে। প্রাচীন মুষ্টিযোদ্ধারা কিন্তু তারিফ দেয় টমকেই। স্যান্ডেল যেই ঘুসি চালাতে যাচ্ছে টমের বাঁ হাতের গ্লাভ্‌স্‌টা নিপুণভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে স্যান্ডেলের ডানহাতের গুলি। ঘুসিগুলো টমের গায়ে এসে লাগছে ঠিকই কিন্তু তার শক্তি হরণ করে নিচ্ছে টমের ওই সামান্য স্পর্শটুকু।

নবম রাউন্ডের শুরুতে এক মিনিটের মধ্যে টমের ধনুকাকার ডানহাতের আঘাতে পরপর তিনবার স্যান্ডেলের অত ভারী দেহখানা লুটিয়ে পড়ল। প্রতিবারই 'নয়' গোনা অবধি পুরো সময়টার সদ্ব্যবহার করে তারপর স্যান্ডেল উঠে দাঁড়িয়েছে। সে আঘাতে আঘাতে বিহ্বল দ্বিধাগ্রস্ত কিন্তু ক্ষমতা হারায়নি। স্যান্ডেলের আর সেই ক্ষিপ্রতা নেই, আগের মতো আর বেহিসাবি শক্তিক্ষয় করছে না। তার প্রধান সম্পদ যৌবনের ভাঁড়ার থেকে যথেচ্ছ ঋণ গ্রহণ করে দাঁতে দাঁত টিপে লড়ে যাচ্ছে। টমের প্রধান সম্পদ কিন্তু অভিজ্ঞতা। তেজ আর প্রাণশক্তির ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ যোদ্ধাজীবনের অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে ঘাটতিটুকু

পূরণ করে নিয়েছে চাতুর্য। নিজের দৈহিক শক্তির অপব্যয় রোধ করার জন্যে একটিও বাড়তি অঙ্গসঞ্চালন তো নয়ই, উপরন্তু প্রতিপক্ষকেই সেই একই ভুল করতে বাধ্য করার কৌশল জানে টম। হাত পা আর দেহের ছলনাময় ভঙ্গিতে বারবার সে প্রলুব্ধ করছে স্যান্ডেলকে। স্যান্ডেল অহেতুক লাফিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, ঘাড় নোয়াচ্ছে বা আক্রান্ত হবার ভয়ে প্রতিরোধমূলক ভঙ্গি গ্রহণ করছে। টম সুযোগ করে অবসর নিচ্ছে লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে, কিন্তু স্যান্ডেলকে একমুহূর্ত নিশ্চেষ্ট থাকতে দিচ্ছে না। এটা পরিণত বয়সের নীতি।

দশম রাউন্ডের শুরুতেই টম বিপক্ষের আক্রমণ রোধ করতে সোজা স্যান্ডেলের মুখের উপর বাঁ হাতের ঘুসি ঝেড়ে গেল পরপর ক'বার। স্যান্ডেল শেষপর্যন্ত পাল্টা কৌশল হিসেবে টমের বাঁ হাতের ঘুসিগুলো মাথা নুইয়ে এড়িয়ে গিয়ে ডানহাতের হুক্ ঝাড়তে শুরু করল টমের মাথায়। আঘাতগুলো জায়গামতো না-লাগায় কার্যকর হয়নি। কিন্তু প্রথম আঘাতটা লাগার পর অচেতনতার সেই সুপরিচিত কালো পর্দাটা নেমে এসেছিল টমের দু-চোখে। সেই মুহূর্তটিতে বা সেই মুহূর্তের এক ভগ্নাংশখানেক সময় টম হারিয়ে গিয়েছিল। আঘাত পাবার আগের মুহূর্তেও দেখেছিল স্যান্ডেল তার মার এড়াতে দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাচ্ছে—দেখেছিল অগণিত দর্শকের মুখগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। তারপরই অন্ধকার। আবার দৃষ্টি ফিরে পেতেই সেই দর্শকদের মুখ আর স্যান্ডেলকে দেখতে পেল টম। এতক্ষণ ঘুমোবার পর এই যেন চোখ খুলল সে। তবে সংজ্ঞাহীন মুহূর্তটি তিলমাত্র স্থায়ী হয়েছিল বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়বারও সময় পায়নি টম। দর্শকরা দেখে টম টলমল করছে, হাঁটুর জোর হারিয়ে ফেলেছে। পরক্ষণেই অবশ্য বাঁ কাঁধের আশ্রয়ে থুতনি গুঁজে নিজেকে সামলে নেয় টম।

পরপর ক'বার একই পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে যায় স্যান্ডেল। টম শেষপর্যন্ত বিহ্বলতা কাটিয়ে আত্মরক্ষার এবং পাল্টা-আক্রমণের উপায় বার করে। বাঁ-হাতে ঘুসি মারবার ভণিতা করে, আধ-পা পিছনে সরে এসে সম্পূর্ণ শরীরের ওজনটুকু কাজে লাগায়, ডানহাতের আপারকাট্ মারে। সময়ের নির্ভুল বিচারে আঘাতটা সোজা গিয়ে পড়ে স্যান্ডেলের মুখের উপর। আঘাতের প্রচণ্ডতা স্যান্ডলকে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলে। তার মাথা আর কাঁধে চোট্ লাগে। পরপর দু'বার স্যান্ডেলকে একইভাবে ধরাশায়ী করে তারপর দড়ির উপর ফেলে ঘুসির বন্যা বওয়ায়। স্যান্ডেলকে একমুহূর্ত অবসর দেয় না সামলে ওঠার—মুহুর্মুহু আঘাতে জর্জরিত করে দেয়। উত্তেজনায় সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রতিটি দর্শক। অবিরাম হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ চঞ্চল। কিন্তু অসামান্য শক্তি আর সহ্যক্ষমতা স্যান্ডেলের। এখনো পায়ের উপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। স্যান্ডেলের নক-আউট হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে এই বীভৎস অত্যাচারের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পুলিশের

এক ক্যাপ্টেন রিঙের ধারে উঠে আসে লড়াই থামিয়ে দেবার জন্যে। ঠিক এমনি সময় ঘণ্টাধ্বনি রাউন্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করে। টলমল করে নিজের জায়গায় ফিরে আসে স্যান্ডেল। পুলিশের ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিবাদ জানায় লড়াই বন্ধ করার চেষ্টা করছে বলে। লড়বার শক্তি আর সামর্থ্য দুটোই তার অটুট আছে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সে দু'বার লাফিয়ে উঠে সরে আসে পেছনে। পুলিশের ক্যাপ্টেন আর হস্তক্ষেপ না করে ফিরে যায়।

পিঠে ঠেস দিয়ে টুলের উপর হতাশভাবে বসে আছে দমছুট টম। লড়াইটা বন্ধ হয়ে গেলে রেফ্‌রি বাধ্য হত টমকে জয়ী ঘোষণা করতে—ঝকঝকে ডলারগুলো চলে আসত পকেটে! টম তো আর স্যান্ডেলের মতো যশ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে লড়ছে না, ওর লড়াই শুধু তিরিশটা ডলারের জন্য। আবার এক মিনিট অবসর পেয়ে গেল স্যান্ডেল, এরমধ্যেই খানিকটা সামলে উঠবে নিশ্চয়।

তরুণের জয় সুনিশ্চিত—কে যেন টমের কানের কাছে গুনগুন করে উঠল। টমের মনে পড়ে গেল স্টাউশার বিল্‌কে হারাবার পর সেই রাতে ও কার মুখে যেন এই একই কথা শুনেছিল। টমের এক অনুরাগী সমর্থক সেদিন ওকে ড্রিঙ্কের আহ্বান জানিয়েছিল। সে-ই বলেছিল কথাগুলো। সেই রাতে টমই ছিল তরুণ আর আজ তারুণ্যের প্রতিমূর্তি বসে আছে তার বিপরীতদিকে। আধঘণ্টা হয়ে গেল লড়ছে টম এবং টমের বয়সটা কম নয়। স্যান্ডেলের মতো লড়লে পনেরো মিনিটের বেশি সে টিকতে পারত না। আসল কথা হল দুই রাউন্ডের মধ্যবর্তী এই সামান্য অবসরে ওর স্ফীত শিরা আর আহত ক্লান্ত হৃৎপিণ্ড হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হচ্ছে না। তাছাড়া দুর্বল শরীর নিয়েই সে লড়াই শুরু করেছে। পা-দুটো ভারী ঠেকছে, শিরায় টান ধরতে শুরু করেছে। দু'মাইল পথ হেঁটে আসা ঠিক হয়নি একেবারে। তাছাড়া সেই সকাল থেকে তার মাংস খাবার দুর্নিবার বাসনাটাও মেটেনি। কসাইরা ওকে ধার দিতে রাজি হয়নি মনে পড়তেই একরাশ ঘৃণা উথলে ওঠে। একজন বয়স্ক মানুষের পক্ষে এমন আধপেটা খেয়ে লড়াইয়ে নামা সত্যিই অসুবিধাজনক! একটুকরো মাংস আর এমন কী ব্যাপার—কয়েক পেনিই তো দাম। কিন্তু সেটুকু জুটলেও আজ হয়তো তিরিশটা ডলার উপার্জন করতে পারত টম।

একাদশ রাউন্ডের ঘণ্টা পড়তেই স্যান্ডেল তেড়ে এল। হাবভাবে যতই চাঙা দেখাতে চাক না কেন আসলে কিন্তু ও তা নয়। টম জানে পুরোটাই ধাপ্পা। মুষ্টিযুদ্ধে মান্ধাতার আমল থেকেই এই ধাপ্পা চালু। স্যান্ডেলের আক্রমণের প্রথম দমকাটার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে টম ওকে প্রথমে আঁকড়ে ধরেছিল। তারপর বাঁধন আলগা করে মুক্ত করে দিল স্যান্ডেলকে। টম যা চেয়েছিল তাই ঘটল। বাঁ হাতের ঘুসি মারার ভড়কি দিতেই স্যান্ডেল একপাশে কাত হয়ে হাত

ঝাঁকিয়ে ঘুসি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে আধ-পা পেছনে সরে মোক্ষম একটা ডানহাতের আপার-কাটে স্যান্ডেলকে ধরাশায়ী করে ফেলল টম। তারপর একমুহূর্তের অবসর নয়—মারের-পর-মার, হুক্ ও ড্রাইভ, হরেক রকমের মারে চুরচুর করে দেয় স্যান্ডেলকে। দড়ির উপর আছড়ে ফেলেছে এবার স্যান্ডেলকে। নিজেও আঘাত পাচ্ছে কিন্তু তার বহুগুণ বেশি আঘাত দিচ্ছে। স্যান্ডেল জড়িয়ে ধরলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে, জড়িয়ে ধরার প্রয়াস পেলেই আঘাত হানছে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হলে নিজেই একহাতে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য হাতের ঘুসির আঘাতে দড়ির গায়ে ঠেলে দিচ্ছে। দড়ির উপর ফেলে দিতে পারলে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারবে না—আরো আঘাত করার সুযোগ মিলবে।

ইতিমধ্যে প্রেক্ষাগৃহ উন্মত্ত। প্রতিটি দর্শক টমের হয়ে চেঁচাচ্ছে : 'শেষ করে দাও! শেষ করে দাও! ওকে শেষ করে ফেলো টম!' লড়াইয়ের অন্তিম পরিণতি আসবে ঘূর্ণিঝড়ের দাপট নিয়ে, এই তো চায় বক্সিঙের আসরের দর্শক।

আধঘণ্টা ধরে শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে টম এই মুহূর্তটির অপেক্ষায়। অকৃপণভাবেই সেই শক্তিকে এখন সে কাজে লাগাচ্ছে। এই তার একমাত্র সুযোগ—পারে তো এখনই পারবে। খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে টমের শক্তির সঞ্চয়। পুরোপুরি ক্ষমতা হারাবার আগেই স্যান্ডেলকে একেবারে ধরাশায়ী করতে পারবে বলে আশা রাখে টম। টম আঘাত হেনে চলে। প্রতিটি আঘাত ঠাণ্ডামাথায় হিসাব করা। কতটা শক্তি ব্যয় হচ্ছে আর কতটা ক্ষতি করতে পারছে তারই চুলচেরা বিচার। স্যান্ডেলের মতো একজনকে নক্-আউট করা যে কী কঠিন তা সে উপলব্ধি করছে এখন। অসামান্য সহ্যশক্তি ছোকরার। এ হিম্মত শুধু তাজা যৌবনেরই থাকে। স্যান্ডেল মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে নাম করবেই। এইরকম কঠিন পেশিতন্তু দিয়েই তৈরি হয় সার্থক যোদ্ধাদের দেহ।

স্যান্ডেল টলমল করে কিন্তু টমেরও পায়ে খিঁচ ধরছে, হাতের গাঁটগুলো বিদ্রোহ করছে। তবু নিজেকে শক্ত করে টম। ভয়ঙ্করভাবে ঘুসি চালায়। প্রতিবার আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে তার জীর্ণ আহত হাতদুটো অশেষ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠছে। নিজে কোনো আঘাত পাচ্ছে না তবু স্যান্ডেলের মতোই প্রতিমুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। ঘুসিগুলো ঠিক জায়গাতেই পড়ছে কিন্তু ঘুসিতে আর সেই জোর নেই। ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির ফসল মাত্র। টম এখন পা ঘষড়ে ঘষড়ে নড়াচড়া করছে। দুর্বলতার লক্ষণটা চোখে পড়া মাত্র স্যান্ডেলের সমর্থকরা চিৎকার করে উৎসাহিত করতে চায় তাকে।

আবার প্রচণ্ড রূপ ধরে টম। পরপর দুটো ঘুসি চালায়—বাঁ হাতের মারটা লাগে একটু উঁচুতে, সোলার প্লেক্সাসে। ডান হাতেরটা এসে পড়ে চোয়ালের উপর।

মারে তেমন জোর ছিল না কিন্তু স্যান্ডেল এত দুর্বল, এতই বিহ্বল যে সঙ্গে সঙ্গে কাটা ছাগলের মতো লুটিয়ে পড়ে সে ছটফট করতে শুরু করল। রেফ্‌রি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সময় গণনা শুরু করে দিল। দশ সেকেন্ড হাঁকার মধ্যে উঠে দাঁড়াতে না-পারলেই হার। পুরো প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে উদ্‌গ্রীব নীরবতা। কম্পিত পায়ে দাঁড়িয়ে আছে টম। মৃত্যুকালীন আচ্ছন্নতা যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। সমবেত দর্শকদের মুখগুলো সমুদ্রের মতো দোল খাচ্ছে, কাছে আসছে, দূরে সরে যাচ্ছে, আর বহুদূর থেকে যেন কানে ভেসে আসছে রেফ্‌রির সময় গণনা—এক—দুই—

এরপরেও যৌবনই একমাত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। স্যান্ডেলও উঠে দাঁড়াল। চার গোণা হতেই সে গড়িয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে শুল। অন্ধের মতো দড়িটা ধরার জন্যে ছটফট করতে লাগল। সপ্তম সেকেন্ডে কোনোক্রমে ঘষড়ে ঘষড়ে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল। মাতালের মতো কাঁধের উপর মাথাটা এলোমেলো দুলছে। রেফ্‌রি 'নয়' হাঁকা মাত্র সিধে উঠে দাঁড়াল স্যান্ডেল! আত্মরক্ষার সঠিক ভঙ্গিতে বাঁ হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে, ডান হাতে ঢেকেছে পেট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি সুরক্ষিত করে বেতালা পা ফেলে টমের দিকে এগিয়ে এল স্যান্ডেল। আশা করছে টমকে জাপটে ধরে আরো খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতে পারবে।

স্যান্ডেল উঠে দাঁড়ানো মাত্র দু'বার ঘুসি চালায় টম। দু'বারই কিন্তু তার আঘাত গিয়ে পড়ে স্যান্ডেলের ভাঁজ-করা হাতের বর্মের উপর। পরমুহূর্তেই স্যান্ডেল মরিয়া হয়ে পাকড়ে ধরে টমকে। দু'জনকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় হাত লাগায় রেফ্‌রি। টমও চেষ্টা করে মুক্তি পাবার। টম জানে যুবকরা কত তাড়াতাড়ি সামলে ওঠে। স্যান্ডেল যদি সামলে ওঠার সময় না পায় টমের জয় সুনিশ্চিত। একটা সোজা আঘাতই যথেষ্ট। স্যান্ডেলকে সে যে-প্যাঁচে ফেলেছে জয় তার অবধারিত। মুষ্টিযুদ্ধের রীতি-নীতি ও কৌশল—সবদিক দিয়েই সে পরাস্ত করেছে স্যান্ডেলকে। জট খুলে যাওয়ায় স্যান্ডেল এবার দূরে সরে গেছে। টিকে থাকা-না-থাকার এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে দোদুল্যমান স্যান্ডেল। একটি উত্তম আঘাত এখুনি ওকে লুটিয়ে ফেলে খেলার নিষ্পত্তি করে দিতে পারে। মাংস খেতে না-পাবার কথাটা আবার খেয়াল হতেই তিক্ততায় ভরে ওঠে সমস্ত মনটা। মাংসটুকু পেলে হয়তো এই মুহূর্তে তার ঘুসিটা ঠিক প্রয়োজনমতো জোরালো হতে পারত। সমস্ত স্নায়ুর শক্তি একত্রিত করে টম ঘুসি মারল কিন্তু তাতে না-আছে জোর, না-আছে গতি। স্যান্ডেল টলে গেল কিন্তু পড়ল না। কোনোরকমে সরে এসে দড়ি ধরে দাঁড়াল। টমও বেসামাল পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে হতাশাগ্রস্ত মানুষের শেষ চেষ্টা হিসেবে আবার ঘুসি চালাল। কিন্তু ওর দেহের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আছে শুধু লড়াকু মনোভাব—তা-ও ম্লান ঝাপসা হয়ে এসেছে ক্লান্তিতে। যে আঘাতটা চোয়ালের উপর পড়ার কথা সেটা কাঁধের উপর এল। আরো উঁচুতে ঘুসিটা চালাতে চেয়েছিল টম কিন্তু

ক্লান্ত মাংসপেশি তার সেই আদেশ পালন করতে পারেনি। উল্টো আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেই টলমল করে ওঠে, আরেকটু হলেই পড়ে যেত। আবার চেষ্টা করে টম। এবার পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট। অপরিসীম ক্লান্তিতে স্যান্ডেলের গায়ের উপর আছড়ে পড়ে। স্যান্ডেলকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে নিজের পতন রোধ করে।

টম নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না। আর তার করার কিছু নেই। টম ফুরিয়ে গেছে। জয়লাভ করেছে যৌবন। আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকার সময়েই টম অনুভব করে স্যান্ডেল শক্তি ফিরে পাচ্ছে। রেফ্‌রি ওদের ছাড়িয়ে দেবার পর টম দেখে সাক্ষাত যৌবন কেমন বলীয়ান হয়ে উঠছে প্রতিমুহূর্তে। প্রথমদিকে স্যান্ডেলের ঘুসিতে কোনো জোর ছিল না, আদৌ কার্যকর হয়নি। কিন্তু ক্রমেই জোরালো আর নির্ভুল হয়ে উঠছে তার মারগুলো। ঝাপসা চোখে টম দেখে গ্লাভ্‌স্ পরা একটা হাত তার চোয়াল লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে হাত তুলে আঘাত বাঁচাতে চায় টম। কিন্তু মন চাইলেও দেহ পারে না। হাত তো নয়, যেন কয়েক মণ সিসে। এমনিতে উঠতে চায় না হাতটা, তাই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তাকে ঠেলে তুলতে চায় টম। গ্লাভস্ পরা হাতটা এসে পড়ল টমের চোয়ালে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার মতো একটা শুধু ঝলক্—সঙ্গে সঙ্গে আঁধারের ওড়না এসে ঢেকে দিল টমকে।

টম চোখ খুলে দেখল, সে রিঙের ধারে নিজের জায়গায় বসে আছে। বন্ডির সমুদ্র উপকূলে ঢেউয়ের গর্জনের মতো ভেসে আসছে দর্শকদের চিৎকার। স্পঞ্জে করে তার ঘাড়ে জল দেওয়া হচ্ছে। মুখ আর বুকের উপর ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে সিড সুলিবান তাকে চাঙা করতে চাইছে। হাতের গ্লাভ্‌স্‌দুটো আগেই খুলে নেওয়া হয়েছে। স্যান্ডেল ওর উপর ঝুঁকে পড়ে করমর্দন করছে। টমকে আজ হারিয়ে দিয়েছে স্যান্ডেল কিন্তু তার জন্যে ওর প্রতি একটুও বিরূপ বোধ করে না টম। উৎফুল্লভাবেই করমর্দন করে। আঙুলের চাপে ভাঙা গাঁটগুলো অত্যন্ত পীড়া দেয়। স্যান্ডেল এবার মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তরুণ-যোদ্ধা প্রন্টোর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে আর বাজির পরিমাণ বাড়িয়ে একশো ডলার করে দেয়। ম্রিয়মাণভাবে তাকিয়ে থাকে টম। সহকারীরা ওর মুখ থেকে জল মুছে মঞ্চ পরিত্যাগের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। হঠাৎ ক্ষুধার্ত বোধ করে টম। খিদের জ্বালা নয়—একটা অবশ ভাব, জঠরের অভ্যন্তরে একটা দপদপানি—যা সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। টমের মনে পড়ে যায় লড়াইয়ের সেই বিশেষ মুহূর্তটার কথা। স্যান্ডেলের তখন পুরোপুরি বিপর্যস্ত বেসামাল অবস্থা। পরাজয়ের গহ্বরে তাকে তলিয়ে দিতে পারত টম অতি সহজেই। মাংসটুকু যদি খেতে পেত—ওই বাড়তি ক্ষমতাটুকু নিশ্চয় থাকত তার। শেষ আঘাতের পেছনে সামান্য একটু ক্ষমতার অভাবই টমের পরাজয় ডেকে এনেছে। শুধু মাংসটুকু খেতে না-পাবার জন্যেই হেরে গেল টম।

দড়ির ফাঁক গলে বেরোবার সময় টমকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল সহকারীরা। তাদের সরিয়ে দিয়ে টম নিজেই মাথা নিচু করে দড়ি পেরিয়ে ভারীপায়ে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামল। সহকর্মীরা ভিড় সরাতে লাগল আর টম তাদের পিছু পিছু চলল। ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে হলঘরটা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতে যাবে, পেছন থেকে কয়েকজন ছোকরা বলে উঠল, 'অমন সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলে কেন?'

'বেশ করেছি!' এককথায় উত্তর সেরে সিঁড়ি ক'টা টপকে রাস্তায় এসে নামল টম।

মোড়ের মাথায় পাবলিক হাউসের সুইঙ-ডোরটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। টম দেখল ভেতরে ঝলমল করছে আলো, হাসিমুখে মহিলারা ড্রিঙ্ক পরিবেশনে ব্যস্ত, আজকের লড়াই নিয়ে আলোচনা চলছে, বারের উপর প্রচুর মুদ্রার ঝনঝনানি। কে যেন চেঁচিয়ে ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ জানাল। একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল টম, তারপর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এগিয়ে চলল।

পকেটে একটা আধলা নেই। দু-মাইল হেঁটে ফেরা সোজা কথা নয়। সত্যিই বয়স হয়ে যাচ্ছে টমের। ডোমেন পেরিয়ে হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চির উপর বসে পড়ল টম। ভাবতেই মনটা দুমড়ে যাচ্ছে যে, লড়াইয়ের ফলাফল জানবার জন্যে ওরই পথ চেয়ে ওর বৌ হাঁ করে বসে আছে বাড়িতে। লড়াইয়ে নক্-আউট হওয়ার চেয়েও ঢের ভয়াবহ এখন ওর সম্মুখীন হওয়া। কী করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে পায় না টম।

অত্যন্ত দুর্বল লাগে। সারা শরীর যেন জ্বলছে। হাতের ভাঙা গাঁটগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় মাটি কাটার কাজ পেলেও এক সপ্তাহের আগে কোদাল বা বেলচা চালাতে পারবে না। খিদেটা যেন আগুন হয়ে জ্বলছে পেটের মধ্যে। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছে। নিজের অসহায় অবসন্ন অবস্থা দেখে ভেঙে পড়ে টম। অবাঞ্ছিতভাবে ভিজে ওঠে দু'চোখ। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বহুদিন আগে স্টাউশার বিলকে হারাবার রাতটার কথা। বেচারা স্টাউশার! এতদিনে টম বুঝতে পারছে স্টাউশার কেন সেদিন ড্রেসিংরুমে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

অস্কার ওয়াইল্ড

নাইটিংগেল ও একটি লাল গোলাপ

(The Nightingale and the Rose)

একজন যুবক ছাত্র আক্ষেপ করে বলল—মেয়েটি কথা দিয়েছে আমি যদি তাকে একটি লাল গোলাপ এনে দিতে পারি তাহলে সে আমার সঙ্গে নাচবে। কিন্তু হায়রে, আমার সারা বাগানে একটিও গোলাপ নেই।

ওকগাছের ডালে বসে একটি নাইটিংগেল তার কথাগুলো শুনল; তারপরে সে পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

ছেলেটির সুন্দর চোখদুটি জলে টলটল করছে।

সারা বাগানে আমার একটিও লাল গোলাপ ফোটেনি। হায়রে, কত ছোট ছোট জিনিসের ওপরেই-না মানুষের সুখ নির্ভর করে! জ্ঞানী মানুষেরা আজ পর্যন্ত যা-কিছু লিখেছেন সে-সবই আমি পড়েছি; দর্শনশাস্ত্রের গোপন রহস্যটুকুও আমার জানা। তবু একটি লাল গোলাপের অভাবে আমার জীবন আজ নষ্ট হতে বসেছে।

নাইটিংগেল পাখি বলল: এতদিন পরে সত্যিকারের একজন প্রেমিকের দেখা পেলাম। আমি জানতাম না এরই জন্য রাতের-পর-রাত আমি প্রেমের গান গেয়েছি। রাত্রির-পর-রাত্রি নক্ষত্রদের কাছে আমি এর গল্পই বলেছি। এখন সাক্ষাতে দেখলাম একে। এর চুলগুলো কচুরিপানার ফুলের মতো কালো কুচকুচে, ঠোঁটদুটি কামনার গোলাপি রঙে রাঙানো; কিন্তু উদগ্র কামনার বিবর্ণ হাতির দাঁতের মতো এর রঙ; গভীর একটি দুঃখ এর কপালে তার চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

যুবকটি বিড়বিড় করে বলল: কাল রাত্রিতে রাজকুমার নাচের আসর বসাবেন। আমার প্রেমিকা যাবে সেখানে নাচতে। আমি যদি তাকে একটা লাল গোলাপ দিতে পারি তাহলে সে আমার সঙ্গে সারারাত নাচবে। আমি যদি তাকে একটা লাল গোলাপ এনে দিতে পারি তাহলে সে আমার বাহুর মধ্যে ধরা দিয়ে আমার বুকের উপরে তার মাথাটা রাখবে; তার দুটি হাত আমার হাতদুটির কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু আমার বাগানে কোনো লাল গোলাপ নেই; তাই আমি

নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে রয়েছি; সে আমাকে অগ্রাহ্য করে চলে যাবে, সে তাকাবে না আমার দিকে; আমার হৃদয় যাবে ভেঙে।

নাইটিংগেল বলল: এই তো আসল প্রেমিক। আমি যে দুঃখের গান গাই সেই দুঃখই এ ভোগ করছে; আমার কাছে যেটা আনন্দ এর কাছে সেইটাই দুঃখ। প্রেম কতই-না আশ্চর্য বস্তু! এমারেলড-এর চেয়েও দামি, ওপ্যাল পাথরের চেয়েও প্রিয়। কোনো দামেই ওকে কেনা যায় না; হাটে-বাজারে ও-জিনিস বিকোয় না।

যুবকটি আক্ষেপ করতে শুরু করল: নাচের মজলিশে বাজনাদারেরা বসে-বসে বাজনা বাজাবে, সেই বাজনার সুরে-সুরে আমার প্রেমিকা নাচবে। এমন লঘু পদ-সঞ্চারে সে নাচবে যে মেঝের উপরে তার পা-ই দেখা যাবে না। রাজপুরুষেরা ভিড় করে দাঁড়াবে তার চারপাশে, কিন্তু আমার সঙ্গে সে আর নাচবে না—আমি তাকে কোনো লাল গোলাপ দিতে পারিনি। এ বলে সে ঘাসের উপরে মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে থাকে।

লেজ তুলে তার পাশ দিয়ে দৌড়ে যেতে-যেতে একটা সবুজ রঙের গিরগিটি হঠাৎ থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল: ছেলেটা কাঁদছে কেন?

সূর্যকণার উদ্দেশে উড়তে-উড়তে একটা প্রজাপতিও সেই একই প্রশ্ন করল: তাই তো, তাই তো!

একটা ডেইজি ফুল তার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করল: ব্যাপারটা কী বলো তো?

উত্তর দিল নাইটিংগেল: ও কাঁদছে লাল গোলাপের জন্যে।

সবাই চিৎকার করে উঠল: লাল গোলাপের জন্যে? অবাক কাণ্ড! ওদের মধ্যে সবচেয়ে নৈরাশ্যবাদী বাচ্চা গিরগিটিটা হেসে উঠল হো-হো করে।

কিন্তু ছেলেটির দুঃখ কোথায় তা বুঝল নাইটিংগেল। ওকগাছের পাতার মধ্যে চুপটি করে বসে সে প্রেমের রহস্যের কথা ভাবতে লাগল।

হঠাৎ দুটো ডানা মেলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল শূন্যে; তারপরে হাওয়ার বুকে উড়তে লাগল। তারপরে ছায়ার মতো সে বাগানের উপর দিয়ে গেল উড়ে। ঘাসের জাজিমের মাঝখানে একটি সুন্দর গোলাপগাছ দাঁড়িয়ে ছিল। তারই পাশে গিয়ে সে বলল: আমাকে একটা লাল গোলাপ দাও। প্রতিদানে তোমাকে আমি আমার সবচেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

ঘাড় নেড়ে গোলাপগাছটি বলল: আমার সব ফুলই শাদা। সমুদ্রের ফেনার মতো শাদা। পাহাড়ে যে বরফ জমে থাকে এর রঙ তার চেয়েও শাদা। পুরনো সূর্যঘড়ির কাছে আমার ভাই রয়েছে। তুমি বরং সেইখানে যাও; তুমি যা চাইছ সে হয়তো তোমাকে তা দিতে পারে।

সূর্যঘড়ির কাছে গিয়ে নাইটিংগেল সেই গোলাপগাছটিকে বলল: আমাকে একটি লাল গোলাপ দাও। প্রতিদানে আমি তোমাকে আমার সবচেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

গাছটি ঘাড় নেড়ে বলল: আমার ফুল হলদে—জল-অপ্সরীদের কেশদামের মতো পীতবর্ণের, মাঠে-মাঠে যে ড্যাফোডিল ফুল ফোটে তাদের চেয়েও বেশি পীত। কিন্তু ওই ছাত্রটির জানালার ধারে আমার একটি ভাই থাকে। তার কাছে যাও, সে হয়তো তোমাকে লাল গোলাপ দিতে পারে।

ছাত্রটির জানালার নিচে যে গোলাপগাছটি জন্মেছে নাইটিংগেল তার কাছে গিয়ে বলল: আমাকে একটি লাল গোলাপ দাও। আমি তোমাকে আমার সবচেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

কিন্তু গাছটি ঘাড় নেড়ে বলল : আমার সব গোলাপই লাল—ঘুঘু পাখির পায়ের মতো লাল—সমুদ্রের তলায় যে প্রবাল রয়েছে তার চেয়েও লাল। কিন্তু শীত আমার শিরাগুলোকে ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধিয়ে দিয়েছে; আর ফোটার আগেই কুয়াশা নষ্ট করে দিয়েছে আমার কুঁড়িগুলোকে। ঝড়ে ভেঙেছে আমার ডাল। সারা বছরই আমার ডালে কোনো ফুল ফোটেনি।

নাইটিংগেল চিৎকার করেই বলল: আমি কেবল একটি লাল গোলাপই চাই—মাত্র একটি। সেটা পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই?

গাছটি বলল: আছে। কিন্তু সেটি এত বিপজ্জনক যে বলতে আমি সাহস পাচ্ছিনে।

: আমাকে বলো। কোনোকিছু করতেই আমি ভয় পাব না।

গাছটি বলল: যদি তুমি লাল গোলাপ পেতে চাও তাহলে চাঁদের আলোয় গান গেয়ে তোমাকে তা তৈরি করতে হবে; রঙিন করে তুলতে হবে তোমার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। কাঁটার বুকে বুক ঠেকিয়ে আমাকে তোমার গান শোনাতে হবে। সারারাত ধরেই গান গাইতে হবে তোমাকে; সেই কাঁটা প্রবেশ করবে তোমার হৃদয়ের গভীরে; তোমার হৃদয়ের রক্ত ঝরে-ঝরে আমার শিরায় প্রবেশ করে আমার নিজস্ব হয়ে উঠবে।

নাইটিংগেল চিৎকার করে বলল: একটা লাল গোলাপের জন্যে মৃত্যু—দামটা বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে। জীবন সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। সবুজ অরণ্যের মধ্যে বসে থাকা বড় মধুর; বসে-বসে সোনার রথে সূর্য আর মুক্তোর রথে চাঁদকে ভেসে বেড়াতে দেখতে খুবই ভালো লাগে। তবু জীবনের চেয়ে মহত্তর প্রেম; আর মানুষের হৃদয়ের কাছে পাখির হৃদয়ের দাম কতটুকু!

এই ভেবে তামাটে রঙের পাখা মেলে সে আকাশে উড়ে গেল।

যুবকটি ঘাসের উপরে পড়ে কাঁদছিল; সে ফিরে এসে দেখল তার সুন্দর চোখদুটির উপর থেকে তখনও জলের দাগ মুছে যায়নি।

সে চিৎকার করে বলল: শান্ত হও। লাল গোলাপ তুমি পাবে। চাঁদের আলোতে বুকের রক্ত দিয়ে সারারাত্রি গান করে তোমার জন্যে একটি লাল গোলাপ আমি

সৃষ্টি করব। প্রতিদানে আমি কেবল এইটুকু চাই যে তুমি সত্যিকার প্রেমিক হবে; কারণ বিজ্ঞ দার্শনিকের চেয়েও প্রেম বিজ্ঞ, ক্ষমতাশালীর চেয়েও প্রেমের ক্ষমতা অনেক বেশি।

মুখ তুলে তাকিয়ে ছেলেটি কথাগুলো শুনল; কিন্তু পাখিটি কী বলতে চাইছে তা সে বুঝতে পারল না, কী করে পারবে? বই-এ লেখা না থাকলে কোনোকিছুই সে বুঝতে পারে না।

কিন্তু ওকগাছ সবই বুঝতে পারল; এবং পেরে দুঃখিত হল। তার কোটরে নাইটিংগেল পাখি বাসা বেঁধেছিল। তাকে ওকগাছ সত্যিই বড় ভালোবাসত।

ঝোপের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে-মনেই বলল—মেয়েটির চেহারা যে নিখুঁত সে-বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু অনুভূতি বলে তার কি কিছু রয়েছে? সেদিক থেকে আমার সন্দেহ যথেষ্ট। আসল কথাটা হচ্ছে অধিকাংশ আর্টিস্টের মতোই তার রয়েছে কেবল ভঙ্গিমা—আর সেটি হল অন্তঃসারশূন্য। পরের জন্যে কোনোরকম আত্মত্যাগ সে করবে না। সে কেবল তার সংগীতের কথাই চিন্তা করে আর সবাই জানে যে, কলা-মাত্রেই স্বার্থপর, কিন্তু তবু তার কণ্ঠস্বরটি যে বড় সুন্দর সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। কী দুঃখ! সেই কণ্ঠস্বর অর্থহীন। কারও কোনো মঙ্গল তা দিয়ে হয় না।

আকাশে চাঁদ উঠতেই নাইটিংগেল পাখিটি সেই গোলাপগাছের কাছে উড়ে এল। কাঁটার মুখে ঠেকিয়ে দিল তার বুক। সেইভাবে বুকটা রেখে সারারাত্রি ধরেই সে গান গাইল। হেলে পড়ে সেই গান শুনতে লাগল চাঁদ। সারারাত্রি ধরেই গান গাইতে লাগল সে। আর কাঁটাটা মুহূর্তে-মুহূর্তে তার বুকের মধ্যে ঢুকতে লাগল। একটু একটু করে ধীরে ধীরে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে শেষ হয়ে এল তার ধমনির রক্ত। গোলাপগাছের ডালে একটি সুন্দর ফুল ফুটে উঠল।

কিন্তু গোলাপগাছটি চিৎকার করে বলল: আরও জোরে, আরও জোরে! খুদে নাইটিংগেল। নতুবা, গোলাপ ফোটার আগেই সকাল হয়ে যাবে।

সুতরাং নাইটিংগেল আরও জোরে কাঁটার মুখে নিজের বুকটা চেপে ধরল; আর সেইসঙ্গে তার গান জোর থেকে জোরালো হয়ে উঠল।

প্রেমিকের চুম্বনে প্রেমিকার গণ্ডে যেমন লজ্জাবিধুর লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে গোলাপফুলের পাতার উপরেও তেমনি মিষ্টি একটি লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কাঁটাগুলো তখনও তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেনি। সেইজন্যে গোলাপের হৃদয়টি তখনও শাদাই রয়ে গেল: কারণ পাখিটির হৃদয়ের রক্ত না-পেলে গোলাপের হৃদয় রক্তবর্ণ ধারণ করবে না। একটা ভীষণ যন্ত্রণা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সেই যন্ত্রণা যতই বাড়তে লাগল ততই তার গান তীব্র থেকে তীব্রতর

হতে লাগল; কারণ তার গান ছিল প্রেমের, যে প্রেম মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সার্থক। কবরখানার মধ্যে তো প্রেমের বিনাশ হয় না।

এবং প্রভাতের মতো সেই অপরূপ গোলাপটি রঙিন হয়ে উঠল!

কিন্তু নাইটিংগেলের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল; ঝটপট করতে লাগল তার খুদে পাখাদুটি; চোখের ওপরে নেমে এল অন্ধকারের ছায়া। তার গান অস্পষ্ট হতে লাগল; মনে হল তার গলাটা যেন আটকে আসছে।

তারপরে সে আর একবার জোরে গান গেয়ে উঠল। শাদা চাঁদ সেই গান শুনল: প্রভাতের কথা ভুলে গিয়ে আকাশের গায়ে অপেক্ষা করতে লাগল। লাল গোলাপ সেই গান শুনল; আনন্দের আতিশয্যে হিল্লোল লাগল তার গায়ে; শীতার্ত প্রভাতের বাতাসে সে তার পাপড়িগুলোকে দিল মেলে।

গোলাপগাছ চিৎকার করে উঠল: দেখ, দেখ! গোলাপ-ফোটা শেষ হল। কিন্তু নাইটিংগেল কোনো উত্তর দিল না। কারণ, লম্বা ঘাসের বনে, হৃদয়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে সে মৃত অবস্থায় রইল পড়ে।

এবং দুপুরের দিকে ছাত্রটি তার জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকাল। তার পরেই সে চিৎকার করে উঠল: কী ভাগ্য! এই তো এখানে একটা লাল গোলাপ! জীবনে এত সুন্দর লাল গোলাপ আর কখনো আমি দেখিনি। এটা এত সুন্দর যে মনে হচ্ছে এর একটি কোনো ল্যাটিন নাম রয়েছে।

এই বলেই ঝুঁকে পড়ে সে লাল গোলাপটি তুলে নিল। তারপরে মাথায় টুপিটা চড়িয়ে সেই গোলাপটি হাতে নিয়ে সে দৌড়ে গেল প্রফেসরের বাড়িতে।

প্রফেসরের কন্যা দরজার সামনে বসে নীলরঙের সিল্কের সুতো গুটোচ্ছিল তখন। তার বাচ্চা কুকুরটা শুয়েছিল তার পায়ের কাছে।

ছাত্রটি চেঁচিয়ে বলল: তুমি বলেছিলে একটি লাল গোলাপ এনে দিলে তুমি আমার সঙ্গে নাচবে। এই সেই গোলাপ—তামাম দুনিয়ায় এর চেয়ে সুন্দর গোলাপ আর কোথাও তুমি পাবে না। এটি তুমি আজ তোমার বুকের কাছে পরবে। আমরা যখন নাচব তখন এটিই তোমাকে বলে দেবে আমি তোমাকে কত ভালোবাসি।

ভ্রুকুটি করল মেয়েটি। বলল: ভয় হচ্ছে; আমার পোশাকের সঙ্গে এটি মানাবে না। আর তাছাড়া চেম্বারলেন-এর ভাইপো আমাকে কয়েকটি আসল জহরৎ পাঠিয়েছেন। সবাই জানে জহরতের দাম ফুলের চেয়ে অনেক বেশি।

ছাত্রটি রাগ করে বলল: সত্যি বলতে কী, বড়ই অকৃতজ্ঞ তুমি।

এই বলে ফুলটিকে সে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল। সেইখানে গাড়ির চাকার নিচে পড়ে সে মিশে গেল মাটির সঙ্গে।

মেয়েটি বলল: অকৃতজ্ঞ! তুমি বড় অভদ্র তো! তাছাড়া তুমি এমন কী একটা বস্তু? মাত্র একজন ছাত্র। চেম্বারলেন-এর ভাইপো'র জুতোর যে মুক্তোর লেস রয়েছে আমার বিশ্বাস তোমার সেটুকু সম্পদও নেই।

এই কথা বলে সে চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

ফিরে যেতে-যেতে ছাত্রটি বলতে লাগল: ভালোবাসাটা কী বাজে জিনিস! লজিকের যা দাম রয়েছে এর দাম তার অর্ধেকও নয়, কারণ এ কিছুই প্রমাণ করে না। এ এমন সব কথা বলে যা কোনোদিন ঘটে না; মানুষকে এ এমন সব জিনিস বিশ্বাস করায় যা কোনোদিনই সত্যি হয়ে ওঠে না। আসল কথাটা হল প্রেম জিনিসটাই অবাস্তব; আর এ জগতে যা বাস্তব নয় তা কোনো কাজের নয়। তার চেয়ে আবার আমি দর্শন আর অধিবিদ্যা শাস্ত্রই পড়তে শুরু করি।

এই বলে নিজের ঘরে গিয়ে ধুলোমলিন বিরাট একটা বই বার করে সে পড়তে শুরু করল।

ম্যাক্সিম গোর্কি

মাকার চুদ্রা

স্তেপের উপর দিয়ে হু হু করে বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ভিজে হিমেল হাওয়া। সেই হাওয়ায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সমুদ্রবেলায় আছড়ে-পড়া জল-ঢেউয়ের বিষণ্ন সুর আর শুকনো লতাগুল্মের মৃদু মর্মর। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে-আনা হলুদ ঝরা-পাতা এসে পড়ছে আমাদের তাঁবুর সামনে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায়, হঠাৎ দীপ্ত হয়ে তা জ্বলে উঠছে। যেন ভয়ে কেঁপে উঠছে শারদ-রাত্রির অতল অন্ধকার। আর মুহূর্তের জন্যে বাঁ-দিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে স্তেপের সীমাহীন উন্মুক্ত প্রান্তর, দক্ষিণে দিগন্তলীন সমুদ্র, আর আমার সামনে—বৃদ্ধ বেদে মাকার চুদ্রা। অদূরে বেদে-তাঁবুর ঘোড়াগুলোর দিকে সে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

এলোমেলো হিমেল হাওয়ায় ফুলে উঠছে ওর গায়ের ককেশীয় কোটটা, চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে ওর নগ্ন লোমশ বুকে! সুঠাম, আন্তরিক ভঙ্গিতে আমার দিকে ফিরে ও তার পেল্লাই পাইপটা টানছে। নাক-মুখ থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার ঘন মেঘ থমথম করছে আমার মাথার উপরে। আমার কাঁধের উপর দিয়ে ও স্তেপের নিস্তব্ধ নিথর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আর অনর্গল বকবক করছে। বাতাসের নির্মমতা থেকে নিজেকে আড়াল করার একটুও চেষ্টা করছে না।

'তাহলে তুইও যাযাবর? পৃথিবী ঘুরে দেখতে বেরিয়েছিস, কী তাই তো? বাহ্ বেশ! ঠিক পথই বেছে নিয়েছিস। এইটেই তো আসল। দু'চোখ ভরে সবকিছু ঘুরে-ঘুরে দেখবি। তারপর যখন দেখবি পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে সারা মন তোর ভরে উঠেছে তখন আর মরতেও কোনো কষ্ট হবে না।'

'কিন্তু, জীবন...'

আমাকে প্রতিবাদ করতে দেখে বৃদ্ধ বাধা দিল। 'কী বললি, জীবন? তোর আত্মীয়স্বজন? তাদের জন্যে তোর এত মাথাব্যথার কী আছে? তোর জীবনও তো একটা জীবন, না কি? আর আত্মীয়স্বজন? তোকে ছাড়া ওরা যেমন দিব্যি বেঁচে আছে তেমনি বেঁচে থাকবে। তুই কি ভাবিস সত্যিই তোকে কারুর প্রয়োজন? তুই তো আর রুটি বা লাঠি নোস যে তোকে ওদের প্রয়োজন হবে!

'হয়তো এক্ষুনি বলবি শিখতে চাই, শেখাতে চাই। কিন্তু কী করে মানুষকে সুখী করা যায় শেখাতে পারবি? পারবি না। তার জন্যে চুলে পাক না-ধরা পর্যন্ত তোকে অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া নতুন কী শেখাবি? সবাই নিজের প্রয়োজনটা বোঝে। যারা চালাক-চতুর জীবনে তারা গুছিয়ে নেয়, যারা বোকা তারা পারে না। কিন্তু জীবনে ঠেকে শেখে সবাই।

'আর এই অদ্ভুত জীবন—মানুষ। এত জায়গা পড়ে থাকতেও সবাই একজায়গায় গুঁতোগুঁতি করবে; প্রত্যেক প্রত্যেককে মাড়িয়ে যাবে...' উপেক্ষার ভঙ্গিতে বৃদ্ধ স্তেপের দিকে নির্দেশ করে বলল, 'অথচ আমাদের এই পৃথিবীটা কী বিশাল! সবাই কাজ করছে, কিন্তু কেউ জানে না কেন কিসের জন্যে কাজ করছে। যখনই কাউকে জমি চষতে দেখি, মনে মনে ভাবি, আহা, সমস্ত শক্তি ঢেলে কপালের ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরাচ্ছে মাটিতে, শুধু একদিন এই মাটিতেই মুখ থুবড়ে পড়বে বলে। তারপর গলে-পচে নষ্ট হয়ে যাবে। জন্মের মতো মৃত্যুও ওর কাছে রয়ে গেল উপেক্ষিত। নিজের জমিটুকু ছাড়া এ জীবনে ও আর কিছুই রেখে গেল না, কিছু দেখল না।

'তুই কি ভাবিস জীবন শুধু মাটি চষার জন্যে, কিংবা নিজের কবর নিজে খোঁড়ার সময় না-পেয়েই মরার জন্যে? মুক্তির স্বাদ কী জিনিস, ও কি কখনও অনুভব করেছিল? কখনও জেনেছিল স্তেপের সীমাহীন বিশালতা, সমুদ্রের আশ্চর্য মর্মর? জন্ম থেকে মৃত্যু অব্দি সারাজীবন কেবল গোলামিই করে গেল।

'এই আমার কথাই ধর্ না কেন, আটান্ন বছর বয়সে আমি যা দেখেছি, লিখে রাখতে গেলে তোর ওই ঝোলার মতো হাজারটা ঝোলাতেও ধরবে না। এমন একটা জায়গার নাম করতে পারবি না, যেখানে আমি যাইনি। এমন সব জায়গায় গেছি যার নামও তুই কখনও শুনিসনি। এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গা কেবল ঘুরে বেড়িয়েছি, বেশিদিন কোথাও আটকে থাকিনি। আর থাকব ই-বা কিসের জন্যে? চলমানতাই তো জীবন! পৃথিবীকে ঘিরে দিনরাত্রি যেমন ছুটে চলেছে, তোকেও তেমনি ছুটতে হবে। না হলে ভাবনা-চিন্তায় জীবনটা হয়ে উঠবে ভয়ঙ্কর রকমের একঘেয়ে, স্থবির। এ আমার নিজের চোখে দেখা। কেননা জীবনে একবার আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। শুধু একবারই ...

'আমি তখন গ্যালিসিয়ার কয়েদখানায় জেল খাটছি। হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তার পোকা ঢুকল—কেন আমি জন্মালুম! বিশেষ করে কয়েদখানার সেই অবরুদ্ধ পরিবেশে এমন একটা করুণ বিষাদ আমাকে পেয়ে বসল, যখনই আমি গারদের ফাঁক দিয়ে উন্মুক্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতুম আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেত। যেন শক্ত মুঠোয় আমার হৃৎপিণ্ডটা কে নিঙড়ে নিত। কিসের জন্যে মানুষ বাঁচে এর জবাব কেউ জানে না। কেউ না। আর তার জন্যে নিজেকে

প্রশ্ন করেও কোনো লাভ নেই। বেঁচে থাকো, ঘুরে বেড়াও, যা কিছু দেখার দেখো, তাহলেই দেখবি বিষাদ বলে আর কিছু থাকবে না।' বৃদ্ধ হাসল। 'আর একটু হলে আমি তো তখন গলায় দড়িই দিচ্ছিলুম।'

'হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলুম। একবার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। বেশ রাশভারী গোছের, তোর মতোই রাশিয়ান। উনি বলতেন, মানুষ যেভাবে চায় সেভাবে বাঁচা উচিত নয়, ঈশ্বর যেভাবে চান সেইভাবেই বাঁচা উচিত। তাহলেই উনি তোমার সব আশা পূর্ণ করবেন। ভদ্রলোকের শতছিন্ন পোশাকের দিকে ইঙ্গিত করে বললুম: ঈশ্বরের কাছ থেকে একপ্রস্থ নতুন পোশাক চেয়ে নিন না! উনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিলেন! অথচ একটু আগে উনিই আমাকে বোঝাচ্ছিলেন প্রতিবেশীকে ভালোবাসা এবং অন্যের দোষত্রুটি ক্ষমা করা উচিত। যদি আমি ওঁকে আঘাত করেই থাকি, ভদ্রলোকের উচিত ছিল আমাকে ক্ষমা করা। এঁরা হলেন সব দ্রষ্টা ব্যক্তি। অন্যকে উপদেশ দেবেন কম খেতে, আর নিজেরা খাবেন দিনে দশবার।'

বৃদ্ধ বেদে পাইপে নতুন করে তামাক ঠাসল। অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে বাতাসের করুণ বিলাপ, হ্রেষাধ্বনি আর জিপসি-তাঁবু থেকে ভেসে-আসা কামনাবিধুর মিষ্টি একটা সুর। মাকার চুদ্রার রূপসী মেয়ে নোনকা গান গাইছে। কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য ধ্বনিমাধুর্যে আমি ওকে চিনতে পারলাম। উজ্জ্বল কালো চোখের দীঘল পল্লব ঘেরা গর্বিত রানীর মতো গাঢ়-বাদামি বর্ণের মুখ। অসম্ভব রকমের আকর্ষণীয় রূপ সম্পর্কে নোনকা সচেতন, এবং নিজের ছাড়া আর সবকিছুর ওপর ওর নিদারুণ বিতৃষ্ণা।

মাকার তার পাইপটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'নে, টান্। মেয়েটা কিন্তু চমৎকার গায়! এরকম একটা মেয়ে তোর প্রেমে পড়লে খুব ভালো লাগত, তাই না?'

'না।'

'তা অবশ্য ঠিক। মেয়েদের কক্ষনো বিশ্বাস করবি না। এই পাইপটাতে টান লাগাতে আমার যত ভালো লাগে, মেয়েরা চুমু খেতে তার চাইতে বেশি ভালোবাসে। কিন্তু ওদের কাউকে একবার চুমু দিলেই দেখবি তোর স্বাধীনতা কোথায় মিলিয়ে গেছে। অদৃশ্য বাঁধনে তোকে এমনি বাঁধবে যে তুই আর কোনোদিন নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবি না। তখন মনপ্রাণ বিলিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই যতটা সম্ভব মেয়েদের থেকে সাবধান থাকবি। ওরা কখনও সত্যি বলে না। ওদের কেউ যদি বলে এ পৃথিবীতে সবচেয়ে তোমাকে বেশি ভালোবাসি, জানবি সামান্য একটা কাঁটার খোঁচায় ও তোর কলজে উপড়ে নিতেও ছাড়বে না। না, কথাটা মিথ্যে নয়। যদি চাস এ সম্পর্কে তোকে একটা সত্যি গল্প শোনাতে পারি। গল্পটা যদি মনে রাখতে পারিস, দেখবি সারাটা জীবন পাখির মতো মুক্ত-স্বাধীন হয়ে কাটিয়ে দিতে পারবি।'

'তাই নাকি?' আমি অবাক হয়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালাম।

'তাহলে শোন্। একসময়ে জোবার, লোইকো জোবার নামে একজন জোয়ান বেদে ছিল। হাঙেরি, বোহেমিয়া, স্লোভানিয়া আর সমুদ্রের আশেপাশের তল্লাটে দুঃসাহসী হিসেবে ওর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এমন দুঃসাহসী যে ভালো একটা ঘোড়া পেলে এক-পল্টন সৈন্যকেও ও তোয়াক্কা করত না, এমনকি স্বয়ং যমরাজকেও নয়।

'প্রতিটা বেদে-তাঁবুর সবাই হয় ওকে জানত, না-হয় ওর নাম শুনেছিল। জীবনে কেবল একটা জিনিসই ও ভালোবাসত—ঘোড়া। তা-ও একটা ঘোড়া বেশিদিনের জন্যে নয়। ভালো না-লাগলেই ঘোড়াটাকে বিক্রি করে ও টাকাটা কাউকে-না-কাউকে দিয়ে দিত। সত্যিকারের কারুর প্রয়োজন হলে নিজের বুকের কলজেটাও ছিঁড়ে দিতে ও দ্বিধা করত না। ও ছিল ঠিক এই ধরনের বেপরোয়া।

'আমি প্রায় বছর-দশেক আগেকার কথা বলছি...আমাদের দলটা তখন বুকোভিনার মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। বসন্তের এক রাত্তিরে আগুনের চারপাশে আমরা সবাই তখন গোল হয়ে বসে গল্প করছি...আমি, কোসাথের লড়াই থেকে ফিরে-আসা পুরনো সেপাই দানিলো, দানিলোর মেয়ে রাদ্দা, বুড়ো নুর, আরও অনেকে।

'আমার মেয়ে নোনকাকে তো তুই দেখেছিস্? রীতিমতো রূপসী। কিন্তু রাদ্দার সঙ্গে তুলনা করলে ওর রূপকে বড্ড বেশিই সম্মান দেওয়া হবে। রাদ্দার রূপকে ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। হয়তো খানিকটা বোঝানো যায় বেহালার সুরের সঙ্গে, তা-ও আবার সমস্ত সত্তা ঢেলে যে সত্যিকারের বাজাতে জানে।

'রাদ্দার রূপে অনেকেরই হৃদয় ঝলসে গ্যাছে। একবার মোরাভিয়ার এক বৃদ্ধ আমির তো ওকে দেখে বোবাই হয়ে গিয়েছিল। ঘোড়ার পিঠে বসে বৃদ্ধ ওর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। গায়ে সোনার সুতোয় নক্‌শা-করা উজ্জ্বল ইউক্রেনিয়ান অঙ্গরাখা, মাথায় মখমলের উষ্ণীষটা যেন একটুকরো নীল আকাশ। কোমরে বাঁকা তরোয়ালের রকমারি দামি পাথরগুলো ঘোড়ার প্রতিটা পদবিক্ষেপে বিদ্যুতের মতো ঝলমল করছিল। সব মিলিয়ে সে যেন পরিভ্রমণরত সাক্ষাৎ কোনো শয়তান! ও যে রীতিমতো ধনী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাদ্দার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ও বলল, 'একটা চুমু দিলে আমার এই টাকার থলিটা তোমাকে দিয়ে দিতে পারি।' রাদ্দা পেছন ফিরে সোজা হাঁটতে শুরু করল। এতে বৃদ্ধের গলার সুর গেল পাল্টে। 'যদি তোমায় অপমানকর কিছু বলে থাকি, আমায় তুমি ক্ষমা করো। কিন্তু আমার দিকে তুমি একবার অন্তত প্রসন্ন চোখে তাকাও।' এই বলে টাকার থলিটা ফেলে দিল ওর পায়ের কাছে। কিন্তু রাদ্দা অবজ্ঞাভরে লাথি মেরে ওটা দূরে সরিয়ে দিল। ওতে কী আছে একবার দেখারও প্রয়োজন বোধ করল না।

"উহ্, অদ্ভুত মেয়ে তো!' চাবুকের তীক্ষ্ণ স্বননে ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে বৃদ্ধ চলে গেল।

'পরের দিনই ও আবার এল। আমাদের তাঁবুর সামনে প্রতিধ্বনিত হল ওর ভরাট কণ্ঠস্বর। 'কে এই মেয়েটির বাবা? ডাকো তাকে।' দানিলো সামনে এগিয়ে এল। 'তোমার মেয়েকে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। কত টাকা চাই বলো?' দানিলো বলল, 'ভদ্রলোকেরাই তাদের সবকিছু বিক্রি করে, শুয়োরছানা থেকে শুরু করে নিজেদের বিবেকবুদ্ধি পর্যন্ত। কিন্তু আমি একদিন কোসাথে লড়াই করেছিলুম, দুটো পয়সার লোভে কোনোকিছু বিক্রি করি না।'

'বৃদ্ধ গর্জন করে উঠল, খাপ থেকে টেনে বার করতে যাচ্ছিল তার বাঁকা তরোয়াল, কিন্তু আমাদের কে-একজন জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তেড়ে আসতেই ঘোড়া ছুটিয়ে ও হাওয়া হয়ে গেল। তাঁবু গুটিয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলুম। পথে দু'দিন কাটবার পর হঠাৎ আবার দেখা হল সেই বৃদ্ধের সঙ্গে। 'এই যে! ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তোমরা যদি মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দাও, আমার যা-কিছু আছে তোমাদের সবাইকে ভাগাভাগি করে দেব। আমার অঢেল সম্পদ আছে।' কামনায় তখন ও ঝড়ের মুখে শুকনো কুটোর মতো থরথর করে কাঁপছে।

'ওর এই কথাগুলো আমাদের সবাইকে ভাবিয়ে তুলল। দানিলো ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে বেটি, তুই কী বলিস?'

'রাদ্দা বলল, 'ঈগল যদি স্বেচ্ছায় কাকের বাসায় ঢুকতে চায়, তাহলে আমার আর কী বলার আছে?'

'দানিলো হেসে উঠল। আমরাও সবাই।

"বাহ্, বেশ বলেছিস তো বেটি! কী মশাই, শুনলেন তো? এখানে আর কিছু হবে না। বরং কোনো পায়রার খোপে গিয়ে খোঁজ করুন, ওরা বেশ ভালো পোষ মানে।' এই বলে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলুম। আর ওর ঘোড়ার খুরের শব্দে দিগন্ত তখন কেঁপে উঠছে। রাদ্দা, ঠিক এইরকম তেজি, বুঝলে ভায়া।

'এর বেশ কিছুদিন পরে, একদিন রাত্তিরে তাঁবুর সামনে আমরা সবাই বসে আছি, হঠাৎ স্তেপের উপর দিয়ে মিষ্টি একটা গানের সুর ভেসে এল। আশ্চর্য মিষ্টি একটা গানের সুর! যেন রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়, আর মনকে টেনে নিয়ে যায় সুদূর কোন্ অজানার দেশে। এমনই অদ্ভুত সেই সুর, যা শুনে মনে হল আমরা পরিপূর্ণ। এর পরে বেঁচে থাকার আর কোনো অর্থ হয় না। আর বাঁচলে তামাম এ দুনিয়ার মালিক হয়েই বাঁচতে হয়।

'অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একজন ঘোড়সওয়ার। বেহালা বাজাতে বাজাতে ও আমাদের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল। আমাদের দিকে

তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। দানিলো আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠল, 'আরে জোবার, তুমি!'

'হ্যাঁ, এই সেই লোইকো জোবার। প্রকাণ্ড গোঁফজোড়াটা কাঁধের দু'পাশে কোঁকড়ানো কালো চুলের গোছার মধ্যে এসে মিশেছে। উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ওর চোখদুটো ঝিকমিক করছে, হাসিটা সূর্যের মতো দীপ্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, ও আর ঘোড়াটা যেন একই পাথর কুঁদে তৈরি। প্রজ্বলিত আগুনের সামনে ওকে রক্তের মতো টকটকে লাল দেখাচ্ছে আর হাসিতে ঝলসে উঠছে শাদা দাঁতগুলো। আমার দিকে ও ফিরেও তাকায়নি, অথচ এক নজরেই আমি যেন ওর প্রেমে পড়ে গেলুম।

'হ্যাঁ, এমন কিছু লোক থাকে, যার দিকে একবার তাকালেই মনে হবে তুমি তার কেনা গোলাম হয়ে গেছ। অথচ তার জন্যে তোমার লজ্জা করবে না, বরং মনে মনে গর্বই অনুভব করবে। অবশ্য তেমন লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আর একদিক দিয়ে সেটা ভালো। কেননা পৃথিবীতে ভালো জিনিসের ছড়াছড়ি হলে তার সত্যিকারের কদর কেউ বুঝতে পারে না। হ্যাঁ, তারপর কী হল বলি শোনো—

'রাদ্দা বলল, 'তুমি তো বেশ ভালোই বাজাও জোবার, তা তোমার মিষ্টি সুরের এই বেহালাটা কে বানিয়ে দিল?'

"কেন, আমি নিজেই বানিয়েছি।' জোবার হাসল। 'তা বলে কাঠ দিয়ে নয়, আমি যাকে ভালোবাসতাম সেই কুমারী মেয়ের স্তন আর তার হৃদয়তন্ত্রী দিয়ে এই বেহালাটা বানানো। এখনও মাঝে মাঝে বেসুরো বাজে বটে, কিন্তু তাকে কেমন করে মুচড়ে দিতে হয় আমি জানি।'

'তুই বোধহয় জানিস না, আমাদের পুরুষেরা কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার একেবারে গোড়াতেই অন্য প্রেমিকার কথা বলে তার চোখদুটোকে এমনভাবে ধাঁধিয়ে দেয় যাতে তার আড়ালে নিজেকে ও বাঁচিয়ে চলতে পারে। এবং জোবারও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ও তো জানে না কার পাল্লায় পড়েছে। রাদ্দা সে-জাতেরই মেয়ে নয়। তারই ঠোঁট উলটে ও বলল, 'আমি শুনেছিলুম জোবার নাকি অসম্ভব রকমের চালাক আর বেপরোয়া। কিন্তু এখন দেখছি সব মিথ্যে।' এই বলে ও চলে গেল।

"বাহ্, তোমার জিভে বেশ ধার আছে তো!' হাসতে হাসতে জোবার ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। 'আদাব, ভাইসব। তোমাদের সঙ্গেই দেখা করতে এলাম।'

'দানিলো স্বাগত জানাল। 'তোমাকে পেয়ে আমরাও খুব খুশি হয়েছি জোবার।'

'তারপর আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলুম। অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব করে শেষে শুতে গেলুম। ভোরে উঠে দেখি জোবারের মাথায় ফেট্টি বাঁধা। কী

ব্যাপার! না, রাত্তিরে ঘোড়ায় নাকি চাঁট মেরেছে। আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না ঘোড়াটা কে। গোপনে সবাই হাসাহাসি করলুম। তা বলে জোবার যে রাদ্দার উপযুক্ত নয়, তা কিন্তু নয়। বরং দু'জনেই সমান এবং মানাবেও বেশ সুন্দর।

'যাই হোক, ওই জায়গায় আমরা কিছুদিন রয়ে গেলুম। দিনগুলো বেশ সুন্দরই কাটছিল। কেননা সঙ্গী হিসেবে জোবার সত্যিই দুর্লভ—অভিজ্ঞতায় বাপ-ঠাকুদ্দাদের মতো, দুনিয়ার হালচালের খবরও বেশ ভালো রাখে। রাশিয়ান আর ম্যাজেয়ার ভাষায় লেখাপড়াও জানে। ও যখন গল্প করত কিংবা বেহালায় সুর তুলত, ঘুম ভুলে আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনতুম। ছড়ের প্রতিটা টানে আমাদের কান্না পেয়ে যেত, হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে লাফিয়ে উঠে থরথর করে কাঁপত। কখনও মনে হত প্রেমিকের কাছ থেকে বিদায়-নেওয়া কুমারীর করুণ মিনতি, কিংবা স্তেপের প্রান্তে ছুরিবেঁধা বুকে গুমরে-ওঠা অসহ্য আর্তবিলাপের মতো। কখনও মনে হত সে যেন আকাশকে গল্প শোনাচ্ছে—রূপকথার গল্প। আবার হঠাৎ করেই আনন্দের খ্যাপা সুরে, কখনও মনে হত সূর্য যেন আকাশে নাচছে। সব মিলিয়ে মনে হত আমরা যেন সুরের কেনা গোলাম হয়ে গেছি। ঠিক সেই মুহূর্তে জোবার যদি কাউকে খুন করতে বলত, আমরা চোখের পলকে খাপ থেকে ছুরি টেনে বার করতুম। আমরা সবাই ওকে দারুণ ভালোবাসতুম। অথচ রাদ্দা ওর দিকে ফিরেও তাকাত না। বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপে ওকে বিদ্ধ করত। আর জোবার তখন দাঁতে দাঁত ঘষে নিজের গোঁফ টেনে ছিঁড়ত, চোখদুটো আগুনের ভাটার মতো জ্বলে উঠত। মাঝে মাঝে রাত্তিরে স্তেপের অনেক গভীরে চলে যেত ও। ভোর না-হওয়া পর্যন্ত বুকফাটা হাহাকার। শুয়ে শুয়ে আমরা কান পেতে শুনতুম আর ভাবতুম, কী করা যায়! দুটো পাথর যখন উপর থেকে একসঙ্গে গড়িয়ে আসছে পরস্পরের ঠোকাঠুকি তাদের লাগবেই!

'সেদিন আগুনের সামনে সবাই বসে গল্প করছি, দানিলো বলল, 'জোবার, আমাদের একটা গান শোনাও। মনটা একটু চাঙা হোক।' জোবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল রাদ্দা আকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে শুয়ে আছে। মুচকি হেসে জোবার বেহালাটা তুলে নিল। ছড়ে টান দিতেই মনে হল ছুরির তীক্ষ্ণ ফলাটা কে যেন সোজা টেনে আনল কুমারীর বুকের ওপর দিয়ে। ও গান ধরল:

হেই-ও হো হো, হেই-ও হো!
হৃদয়ে আমার অগ্নি-দাহন
সমুদ্র যেন ধুধু তেপান্তর,
বাতাসের বেগে তোমাকে আমাকে নিয়ে
আহা, ছুটে যাবে বুঝি দীপ্ত তুরঙ্গম।

'কনুইয়ে ভর রেখে রাদ্দা মুখ ফিরিয়ে হাসল। রাঙা হয়ে উঠল জোবারের সারা মুখ।

হেই-ও হো হো, হেই-ও হো!
বন্ধু, তেপান্তরের রাত্রি হল ভোর
আমরা এখন দু'জনে কোথায় যাব?
ঘোড়ার খুরে দিনের আলো মেশে
রূপসী চাঁদ তখনও প্রিয়ার কেশে।

'রাদ্দা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'দেখো, রূপসী চাঁদ ধরতে আবার যেন খানাখন্দে উল্টে পোড়ো না। তাহলে তোমার অমন খাসা গোঁফজোড়াটাই নষ্ট হয়ে যাবে।'

'জোবার কোনো কথা বলল না, শুধু জ্বলন্ত চোখে একবার ওর দিকে তাকাল। তারপর নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে ও আবার গেয়ে চলল:

হেই-ও হো হো, হেই-ও হো!
দিনের আলো যদি এসে দ্যাখে
অশ্বারূঢ় আমরা দু'জনে ঘুমিয়ে,
আমাদের মুখ লজ্জায় রাঙা হবে
যখন আমরা লাফিয়ে নামব সবে।

'বাহ্, চমৎকার!' দানিলো বলল, 'এমন সুন্দর গান এর আগে আমি আর কখনও শুনিনি।' একমাত্র রাদ্দা ছাড়া আমরা সবাই তখন খুশিতে ঝলমল করছি। হঠাৎ ও দুম করে বলে বসল, 'আহা, কী গানের ছিরি! মাছি হয়ে যেন ঈগলের ডাককে নকল করতে যাওয়া!' আমাদের সমস্ত আনন্দ ও যেন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল। দানিলো তো প্রচণ্ড রাগে ওর দিকে তেড়ে গেল। 'দাঁড়া ছেমড়ি, আজ তোকে আমি চাবকে সিধে করছি!' কিন্তু জোবার দ্রুত উঠে ওকে বাধা দিল। বেচারির সারা মুখ পোড়ামাটির মতো শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। 'থামো দানিলো, থামো। তেজি ঘোড়ার জন্যে চাই শক্ত লাগাম। তোমার মেয়েকে বরং আমার সঙ্গে বিয়ে দাও।'

'শাব্বাশ!' দানিলো খুশিতে চলকে উঠল। 'ও যদি রাজি থাকে তুমি ওকে বিয়ে করো।'

'ঠিক আছে।' জোবার রাদ্দার দিকে ফিরে বলল, 'শোনো, জীবনে আমি অনেক অনেক মেয়ে দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো কেউ এমন করে আর আমার হৃদয় কেড়ে নিতে পারেনি। কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই, যা হবার তো হবেই। কেউ তো আর নিজের মনের কাছ থেকে পালাতে পারে না। তাই ঈশ্বর আর নিজের বিবেককে সাক্ষী রেখে তোমার বাবা আর এইসব ভাইবন্ধুদের সামনে আমি তোমাকে বউ হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। কিন্তু একটা কথা—আমার স্বাধীন ইচ্ছেয়

তুমি কখনও বাধা দিতে পারবে না। স্বাধীনতা আমি দারুণ ভালোবাসি এবং সেইভাবে সারাটা জীবন কাটাতে চাই।' আমরা দেখলাম কথা বলতে বলতেই ও দু'হাত বাড়িয়ে রাদ্দার দিকে এগিয়ে গেলো। মনে মনে ভাবলুম, যাক, স্তেপের দুর্দান্ত ঘোড়াটাকে শেষপর্যন্ত রাদ্দাই বশ মানাল। কিন্তু হঠাৎ দেখলুম দু'হাত উপরে তুলে জোবার মাটিতে আছড়ে পড়ল, শক্ত মাটিতে মাথাটা ঠুকে শব্দ হল ঠক্ করে।

'কেমন করে হল? মনে হল যেন ওর বুকে গুলি বিঁধেছে। আসলে রাদ্দা চাবুকের দড়িটা ওর পায়ে জড়িয়ে আচমকা এক টান দিয়েছিল। টাল সামলাতে না পেরে জোবার পড়ে গিয়েছিল।

'তারপর আবার নিশ্চল ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে রাদ্দা রইল, দু-ঠোঁটে চাপা তার একটুকরো অবজ্ঞার হাসি। এর পরে কী ঘটে দেখার জন্যে আমরা ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলুম। জোবার ধীরে ধীরে উঠে বসল। দু'হাতে ও মাথাটা এমনভাবে চেপে ধরে আছে যেন এক্ষুনি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ও শান্তপায়ে স্তেপের দিকে চলে গেল, কারুর দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। নুর আমার কানে কানে বলল, 'ওর ওপর একটু নজর রাখো।' অন্ধকারে আমিও তখন চুপিচুপি ওর পিছু নিলুম।'

পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে মাকার আবার নতুন করে তামাক ঠাসল। কোটটা ভালো করে টেনেটুনে আমিও একপাশে কাত হয়ে শুলাম, যাতে রোদে-পোড়া ওর তামাটে মুখটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। বাজ-পড়া অথচ তখনও বেশ শক্ত আর মজবুত পুরনো ওক্‌গাছের মতো সুঠাম ভঙ্গিতে ও আমার মুখোমুখি বসে রয়েছে। এলোমেলো চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়। সমুদ্রের মর্মর, স্তেপের বুক থেকে উড়িয়ে-আনা বাতাসের অশান্ত বিলাপ শোনা যাচ্ছে। নোনকার গান থেমে গেছে। কালো মেঘগুলো শরতের রাত্রিকে আরও নিবিড় করে তুলেছে।

'তারপর তুমি কী করলে?' আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'অন্ধকারে আমি দেখলুম, জোবার পা টেনে টেনে হাঁটছে। মুখটা নিচু, হাতদুটো পাশে চাবুকের ফিতের মতো ঝুলছে। বেশকিছুটা এগিয়ে ছোট্ট একটা নদীর ধারে উঁচু একটা পাথরের উপরে ও বসল। তখনও যন্ত্রণায় গুঙিয়ে-ওঠা ওর আর্তনাদে আমার বুকের ভেতরটা যেন ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু আমি ওর সামনে যেতে পারছি না। তাছাড়া শুধু কথা দিয়ে তো আর কারুর দুঃখ দূর করা যায় না, তাই অপেক্ষা করলুম। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা চুপচাপ বসে রইলুম।

'খানিকটা পরে মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ উঠল। ঝিলিমিলি জোছনায় ভেসে গেল প্রান্তরের সারা বুক। অনেক দূরের জিনিসও বেশ স্পষ্ট নজরে পড়ে। হঠাৎ দেখি কী, রাদ্দা দ্রুতপায়ে এইদিকেই এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে আমার মনে স্ফূর্তি হল। মনে মনে তারিফ করলুম, নাহ্, মেয়েটার সত্যিই সাহস আছে।

কোনোরকম পায়ের শব্দ না করে রাদ্দা জোবারের দিকে এগিয়ে গেল, পিছন থেকে দু'হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরল। চমকে উঠে জোবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর চকিতে কোমর থেকে ছুরিটা টেনে বার করল। সর্বনাশ, জোবার কি ওকে খুন করে ফেলবে নাকি! সবে চিৎকার করে বাধা দিতে যাব, হঠাৎ শুনলুম, 'হাত থেকে ছুরিখানা ফেলে দাও, নইলে তোমার মাথা আমি গুঁড়িয়ে দেব।' দেখলুম রাদ্দার হাতের পিস্তলটা জোবারের মাথা লক্ষ্য করে উঁচিয়ে রয়েছে। আচ্ছা শয়তান তো! তবু ভাবলুম, যাক, দু'জনের কেউ একপা-ও কম যায় না। দেখা যাক এর পরে কী হয়।

'কোমরে পিস্তল গুঁজে রাদ্দা বলল, 'শোনো, তোমাকে আমি খুন করতে আসিনি, এসেছি কিছু বলতে। ছুরিটা তুমি নামিয়ে নাও।' ছুরিটা ফেলে দিয়ে জোবার ক্রুদ্ধচোখে তাকাল। উহ্, সে কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! যেন হিংস্র দুটো পশু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনেই যেমন সুন্দর, তেমনি সাহসী। চাঁদ আর আমি ছাড়া এ দৃশ্য দেখার সুযোগ আর কেউ পায়নি।

'শোনো জোবার, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' রাদ্দার কথায় জোবার শুধু হাত-পা-বাঁধা অসহায় মানুষের মতো কাঁধ ঝাঁকাল, কোনো কথা বলল না। 'জীবনে আমিও অনেক দুঃসাহসী জোয়ান দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো দুঃসাহসী আর সুন্দর পুরুষ আমি আর একজনও দেখিনি, জোবার। আমি চাইলে ওদের যে-কেউ গোঁফ কামিয়ে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু ওদের কেউই তেমন দুঃসাহসী নয়। এখন পর্যন্ত কোনো জিপসিকেই আমি ভালোবাসতে পারিনি, জোবার। শুধু তোমাকে ছাড়া। আমিও স্বাধীনতা ভালোবাসি। তোমাকে যতটা ভালোবাসি হয়তো তার চাইতে বেশি। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি যে বাঁচতে পারব না, জোবার। দেহে মনে আমি যে তোমার সবটুকুকে চাই। শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি দোহাই তোমার, থেমো না, বলে যাও।'

'আর কী বলব, জোবার? তুমি আমার, আমি তোমাকেই চাই! এক-মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে চুমু আর আদরে আমার কামনাকে তুমি পরিপূর্ণ করে ভরিয়ে দাও। আর আমিও তোমাকে চুমুর জাদুতে ভুলিয়ে দেব তোমার অতীতের বেপরোয়া জীবন। তোমার বিষাদের করুণ গান স্তেপের জিপসিরা আর কোনোদিন শুনতে পাবে না। তার বদলে ওরা শুনবে রাদ্দার জন্য গাওয়া মিষ্টি প্রেমের গান। তাই আর দেরি না করে কালই তুমি তাঁবুর সকলের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আমার ডান হাতে চুমু দেবে—তারপরেই আমি তোমার হয়ে যাব।'

'শয়তানি আর কাকে বলে! পাগলেও এমন কথা কখনও শোনেনি। হয়তো প্রাচীন বুড়োরা বলবে আদিমকালে মন্তেনগ্রিনদের মধ্যে এ-রকম একটা রীতি ছিল বলে শুনেছি বটে, কিন্তু বেদেদের মধ্যে এমন রেওয়াজ কোনোকালেই ছিল

না। তাই জোবার শিউরে উঠল, ওর চাপা আর্তনাদ ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হল প্রান্তরের বুকে।

'তাহলে আজকের মতো বিদায়, জোবার। যা বললুম, কাল মনে থাকবে তো?'

'থাকবে রাদ্দা, থাকবে।'

'রাদ্দা চলে যাবার পর জোবার ডানা-ভাঙা পাখির মতো ঘাড় গুঁজে বসে রইল। ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে আমাকে বেশ খানিকটা কষ্ট করতে হয়েছিল। ওর যন্ত্রণায় আমার নিজেরই বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল। তাঁবুতে ফিরে এসে বৃদ্ধদের সব বললুম। ওরা ভেবেচিন্তে ঠিক করল—দেখা যাক কী ঘটে। সেদিনই সন্ধেবেলায় আগুনের সামনে আমরা সবাই গল্প করছি, জোবার এল। থমথমে মুখ, চোখের পাতাদুটো নামানো। এক রাত্তিরেই চোখদুটো বসে গেছে, চোখের নিচে কালি। মাটির দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'ভাইবন্ধুরা সব, নিজের মনকে আমি ভালো করে যাচাই করে দেখেছি। কিন্তু এতদিন যে স্বাধীন জীবন আমি যাপন করেছি, আজ আমার কাছে তার আর কোনো স্থান নেই। তার সবটুকুর স্থান অধিকার করে রয়েছে রূপসী রাদ্দা। সেখানে ও গর্বিতা রানীর মতো বসে হাসছে। আমাকে যতটা ভালোবাসে তার চাইতে স্বাধীন জীবনকে ও বেশি ভালোবাসে, আর আমি আমার স্বাধীন জীবনের চাইতে রাদ্দাকে বেশি ভালোবাসি। তাই আমি ঠিক করেছি রাদ্দার আদেশমতোই ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসব, আর সবাই দেখবে দুঃসাহসী লোইকো জোবার, যে এতদিন পায়ের নিচে মেয়েদের পোষা বেড়ালের মতো খেলিয়েছে, আজ সে রাদ্দার রূপের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিল। কেননা চুমুতে সোহাগে ও আমাকে এমনভাবে ভরিয়ে দেবে যে আমি আর কখনও গান গাইতে পারব না। তুমি ঠিক এই চাও, তাই না রাদ্দা?' জোবার ভীষণ-চোখে রাদ্দার দিকে তাকাল। রাদ্দা নিঃশব্দে ওর পায়ের নিচের মাটি নির্দেশ করল। আমরা কল্পনাও করতে পারছি না কেমন করে তা সম্ভব। আমাদের তখন ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে চলে যাই। এমন বিষণ্ন আর খারাপ লাগছিল যে নিজেরাই লজ্জায় মরে যাচ্ছিলুম।

'কী ব্যাপার?' রাদ্দা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'এত ব্যস্ত কিসের? এখনও অনেক সময় আছে, রাদ্দা।' ইস্পাতের মতো কঠিন হাসিতে ঝিকঝিক করে উঠল জোবারের শাদা দাঁতগুলো।

'তাহলে ভাইসব, তোমরা নিজে চোখেই দেখলে। এখন একটা জিনিস শুধু আমার দেখা বাকি আছে—রাদ্দা যতটা ভাবে তার হৃদয় সত্যিই ততটা কঠিন কিনা। আর সেটা যাচাই করব আমি নিজে। তোমরা আমায় ক্ষমা কোরো।

'কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা দেখলুম, রাদ্দা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। জোবারের বাঁকানো ছুরিটা আমূল বেঁধানো রয়েছে ওর বুকে। আমরা সবাই নির্বাক।

'কিন্তু রাদ্দা একটানে ছুরিটা বুক থেকে তুলে ফেলল। ঘন কালো চুলের গুচ্ছ চেপে ধরল গভীর ক্ষতে। তারপর কোনোরকমে দু-ঠোঁটের কোলে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'বিদায়, জোবার। আমি জানতুম তুমি এমন করবে।' তারপর ও আর কোনো কথা বলতে পারল না, মরে গেল।

'ও যে কী মেয়ে সে তুই কল্পনাও করতে পারবি না!

'এইবার আমি তোমার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসব, গর্বিতা রানী আমার!'

'এতক্ষণে জোবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। প্রান্তরের বুকে ছড়িয়ে পড়ল ওর বুকফাটা হাহাকার। মৃত রাদ্দার দু'পায়ে ঠোঁট চেপে ও নিথর হয়ে পড়ে রইল। আমরা মাথা থেকে টুপি খুলে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলুম।

'ওইরকম একটা মুহূর্তে আর কীই-বা বলার আছে? কিছু না। নুর ফিসফিস করে বলল, 'ওকে বেঁধে রাখা উচিত।' কিন্তু জোবারকে বাঁধতে কারুর হাতই উঠবে না। এবং সেটা নুরও ভালো করে জানত। তাই দু'হাতে মুখ ঢেকে ও ঘুরে দাঁড়াল। দানিলো ছুরিটা তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। ঝকঝকে ধারালো ফলাটা তখনও রাদ্দার তাজা রক্তে রাঙা হয়ে রয়েছে। তারপর দানিলো জোবারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল ওর পিঠে। ফলাটা সোজা গিয়ে বিঁধল ওর হৃৎপিণ্ডে। কেননা, হাজার হোক দানিলো পুরনো সেপাই, রাদ্দার বাবা।

'আমি ঠিক এইটেই চেয়েছিলাম।' দানিলোর দিকে ফিরে জোবার পরিষ্কার গলায় বলল। তারপর সে-ও রাদ্দার সঙ্গে চলে গেল।

'আমরা ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। বুকে চুলের গুচ্ছ নিয়ে রাদ্দা শুয়ে রয়েছে, চোখগুলো মেলা রয়েছে নীল আকাশের দিকে। আর ওর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে দুঃসাহসী লোইকো জোবার। কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুলে ঢেকে গেছে সারামুখ।

'আমরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বৃদ্ধ দানিলোর গোঁফজোড়াটা মৃদু কাঁপছে, ঘন ভ্রুদুটো কুঁচকে গেছে। নির্নিমেষ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বুড়ো নুর কিন্তু আর নিজেকে সামলাতে পারল না, মাটিতে আছড়ে পড়ল। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে ওর সারা শরীর।

'সত্যি, কাঁদবার যথেষ্ট কারণ ছিল বইকি। তাই বলছিলুম, তুই যে-পথেই যাস না কেন, কোনো প্রলোভনের মোহে নিজেকে বিকিয়ে দিবি না। তাহলে দেখবি কোনোদিন আর অনুশোচনা করতে হবে না। এই কথাটাই শুধু তোকে বলতে চেয়েছিলুম।'

মাকার চুপ করল। পাইপটা তামাকের থলেতে ভরে কোটটা ভালো করে বুকের উপর টেনে দিল। বউ-নাচুনি বৃষ্টি পড়ছে। বাতাসের বেগ আরও বাড়ল। ক্রুদ্ধ আক্রোশে সমুদ্র ফুলছে। এবার একটা-দুটো করে ঘোড়াগুলো নিভন্ত

আগুনের আশেপাশে জড়ো হতে শুরু করল। বড় বড় উজ্জ্বল চোখ মেলে আমাদের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল।

'আয়, আয়!' মাকার আদর করে ডাকল। তারপর ওর সবচেয়ে প্রিয় কালো ঘোড়াটার গলায় হাত বুলোতে বুলোতে আমাকে বলল, 'নে, এবার শুয়ে পড়্।' তারপর নিজেও ককেশিয়ান কোটটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। আমার কিছুতেই ঘুম এল না। চুপচাপ বসে অন্ধকার প্রান্তরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম। আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল গর্বিতা, অনন্যা রূপসী রাদ্দার ছবি। চূর্ণকুন্তল চেপে রয়েছে বুকের ক্ষতে, দীঘল বাদামি আঙুলের ফাঁক দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে মাটিতে। আর ওর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে দুঃসাহসী বেদে লোইকো জোবারের বিশাল দেহটা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে ঢেকে গেছে সারামুখ।

এবার আকাশ ঝামরে বৃষ্টি নামল। লোইকো জোবার আর বুড়ো দানিলোর রূপসী মেয়ে রাদ্দা—অপূর্ব দুটি জিপসির জন্যে সমুদ্র শোকগাথা গাইছে।

আর ওরা দু'জন যেন অন্ধকার ঘন কুয়াশার মধ্যে ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও বেপরোয়া জোবার গর্বিতা রাদ্দাকে কিছুতেই ধরতে পারছে না।

গী দ্য মোপাসাঁ

নেকলেস

(La Parure)

সে ছিল তাদেরই একজন।

এমন অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে যারা ভাগ্যের পরিহাসে নীচকুলে জন্মায়; তাদের টাকা বা উপযুক্ত যৌতুক দেবার ক্ষমতা না-থাকায় এমন কোনো ধনী লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হবার কোনো আশা থাকে না যারা তাদের প্রেমে পড়বে এবং তাদের বিয়ে করবে। সে ছিল সেইসব মেয়েদেরই একজন। তাই সে লোকশিক্ষা দপ্তরের ছোট কেরানিকে বিয়ে করতে রাজি হতে বাধ্য হয়েছিল।

সে খুব শাদাসিধে পোশাক পরত, কারণ দামি জমকালো পোশাক কেনার ক্ষমতা তার ছিল না। বিয়েটা তার সমানে সমানে হয়নি এ-কথা ভেবে সে মনোকষ্ট পেত সবসময়। মেয়েরা কখনো বর্ণ, শ্রেণী বা বংশমর্যাদার ওপর নির্ভর করে না। দেহগত সৌন্দর্য আর সুষমাকে বংশমর্যাদার থেকে দাম দেয় বেশি। তাদের মতে, সহজাত সৌন্দর্যচেতনা, মার্জিত রুচিবোধ এবং সহনশীলতা আভিজাত্য লাভের পক্ষে বড় গুণ এবং এই গুণ যেসব মেয়ের আছে তাদের তারা অভিজাত সমাজের নামকরা মেয়েদের সমপর্যায়ভুক্ত হিসেবে দেখে। ভোগ-বিলাসের ওপর তার একটা সহজাত অধিকার আছে—এ বিষয়ে একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল তার মনে, আর এই প্রত্যয়ের জন্য সবসময় অসন্তোষজনিত একটা তীব্র চঞ্চলতা অনুভব করত। তার বাড়ির চারদিকের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করত সে। তার ঘরের ময়লা দেওয়ালগুলো, পুরনো আসবাবপত্র, কমদামি বিছানা—এই সবকিছু দেখে মনে মনে কষ্ট পেত সে, সংসারজীবনের যতসব অভাব-দৈন্য আর ছোটখাটো অজস্র খুঁটিনাটির কথা তার মতো মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা ভাবেই না। সে সেইসব কথা ভেবে ভেবে অযথা একটা মানসিক যন্ত্রণায় ভুগত। ভিতরে ভিতরে দারুণ রেগে যেত। তার বাড়ির একমাত্র ঝি ব্রেতোঁকে দেখে তার মনে অনেক অস্পষ্ট কামনা-বাসনা জাগত। ব্রোঞ্জের বাতিদানের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ও দামি কার্পেট মোড়া কত

সুসজ্জিত ঘরের স্বপ্ন দেখত সে, যে ঘরের টেবিলে থাকবে কত অমূল্য গয়না। সেইসব সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত ঘরের ভিতর থাকবে ছোট ছোট নিরালা কোণ যেখানে সে সেজেগুজে রোজ সন্ধ্যায় বসে বসে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করবে। এমন সব খ্যাতিমান সুন্দর সুন্দর পুরুষবন্ধু তার বাড়িতে আসবে যারা যে-কোনো নারীর কাম্যবস্তু।

রোজ ডিনার খাবার সময় তার মনমেজাজ খারাপ হয়ে যেত নতুন করে। একটা পুরনো টেবিলে যে কাপড়ের চাদরটা পাতা থাকত তা তিন-চারদিন ঘরে কাচাই হত না। তার স্বামী বসত টেবিলটার উল্টোদিকে। ঝোলের উপর থেকে ঢাকনাটা খুলেই রোজ সে বলে উঠত: কী চমৎকার! এটা আমার খুবই প্রিয়। কিন্তু তার মন তখন কল্পনার পাখনায় ভর করে উড়ে যেত সেইসব সুন্দর ও সুসজ্জিত খাবারঘরে যার দেওয়ালগুলোতে কত রূপকথার ছবি আঁকা, যেখানে সুদৃশ্য টেবিলে রুপোর পাত্রে কত উপাদেয় খাদ্যবস্তু পরিবেশন করা হয়।

তার কোনো সুন্দর গাউন বা গয়না ছিল না। তবু তার মনে হত এইসব জিনিস তার পাওয়া উচিত, তার মতো সুন্দরী মেয়ের পক্ষে এগুলো উপভোগ করার অধিকার তার জন্মগত। দামি জমকালো পোশাক পরে নারী-পুরুষের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করার মধ্যে সে কী আনন্দ! তার একজন ধনী বান্ধবী ছিল, তার সঙ্গে স্কুলে পড়েছিল। আগে মাঝে মাঝে তার কাছে যেত, কিন্তু এখন আর যায় না, কারণ তার ঐশ্বর্য দেখে মনে কষ্ট হত তার। তার বাড়ি থেকে আসার পর সারাদিন নিবিড় দুঃখ, অনুশোচনা আর হতাশায় চোখ ফেটে জল আসত।

একদিন তার স্বামী সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরার সময় একটা নিমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে এল। বলল: তোমার জন্য একটা ভালো খবর এনেছি।

খামটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে সে দেখল একটা কার্ডের উপর লেখা রয়েছে : ১৯ জানুয়ারি সোমবার লোকশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ও মাদাম বাপল্লো শিক্ষাদপ্তরের অফিসে অনুষ্ঠিত এক প্রীতিভোজে মঁসিয়ে ও মাদাম লয়সেলের উপস্থিতি কামনা করেন।

তার স্বামী ভেবেছিল কার্ডটা পেয়ে আনন্দিত হবে সে। কিন্তু আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে সে রেগে কার্ডটা ছুড়ে ফেলে দিল। বলল: এতে আমার কী হবে?

কেন প্রিয়তমা? আমি ভেবেছিলাম তুমি খুশি হবে। তুমি কোথাও যাও না, তাই বাইরে যাওয়ার এটা একটা চমৎকার সুযোগ তোমার পক্ষে। এটা পেতে আমার এমন কিছু অসুবিধা হয়নি। অনেকেই এ নিমন্ত্রণপত্র পাবার জন্য চেষ্টা করছিল। তবে অতিথিদের সংখ্যা সুনির্বাচিত বলে কেরানিদের খুব অল্প নিমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয়েছে। তুমি সেখানে আমাদের অনেক সহকর্মীদেরই দেখতে পাবে।

সে রাগের মাথায় প্রশ্ন করল: এই ধরনের অনুষ্ঠানে আমি কী পরে যাব?

এ-কথা আগে ভেবে দেখেনি মঁসিয়ে লয়সেল। তাই ইতস্তত করে বলল: কেন, তুমি যে-পোশাকটা পরে থিয়েটার দেখতে যাও, সেটা তো আমার খুব ভালোই লাগে...

বলতে বলতে থেমে গেল লয়সেল। সে ভয়ে ভয়ে দেখল, তার স্ত্রীর চোখে জল এসেছে। দুটো বড় জলের ফোঁটা তার গলা বেয়ে ধীরে ধীরে ঝরে যাচ্ছে। সে বলল: কী এমন হল?

প্রবল চেষ্টার দ্বারা নিজের আবেগটা দমন করে ভিজে গালদুটো মুছে শান্ত গলায় মাদাম লয়সেল বলল, কিছু না। আমার ফ্রক নেই, সুতরাং আমি ওখানে যেতে পারি না। এই নিমন্ত্রণপত্রটা তোমার অফিসের কোনো বন্ধুকে দিয়ে দাও।

মহা মুশকিলে পড়ল লয়সেল। বলল: তোমার মতে একটা ফ্রক কিনতে কত লাগবে? ফ্রকটা অবশ্য পরে অন্য অনুষ্ঠানেও পরে যাওয়া যাবে।

তার স্ত্রী ভাবতে লাগল। হিসাব করে দেখতে লাগল। কিন্তু খুঁজে পেল না, কী দাম বলবে। বুঝতে পারল না সে দাম শুনে তার মিতব্যয়ী কেরানি স্বামী চমকে উঠবে কিনা এবং সঙ্গে সঙ্গে সে দাম দিতে অস্বীকার করবে কিনা। অবশেষে বলল: আমি তা জানি না। পরে একটু ভেবে ভয়ে ভয়ে বলল: তবে চারশো ফ্রাঁ হলে হয়ে যাবে।

লয়সেলের মুখটা মলিন হয়ে গেল। তার স্ত্রী যে-টাকাটার কথা বলেছে সেই টাকাটা সে একটা পাখি-শিকারের বন্দুক কেনার জন্য জমিয়েছে। তার অনেক আশা ছিল সামনের গ্রীষ্মের কোনো রবিবার তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে নান্‌তেরে ভরতপাখি শিকার করতে যাবে। তবু সে উত্তর করল: ঠিক আছে। আমি তোমাকে চারশো ফ্রাঁ-ই দিয়ে দেব। তবে মনে রেখো গাউনটা যেন ভালো হয়।

অনুষ্ঠানের দিন ঘনিয়ে এল। মাদাম লয়সেলের গাউন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে খুশি হল না। কেমন যেন অসন্তুষ্ট আর বিষণ্ন দেখাল তাকে। তার স্বামী তাকে প্রশ্ন করল একদিন সন্ধ্যাবেলায়: কী ব্যাপার! তোমাকে দিনদিন কেমন আত্মভোলার মতো দেখাচ্ছে।

মাদাম লয়সেল বলল: আমার কোনো গয়না নেই এ-কথাটা ভাবতে খুব খারাপ লাগছে। ওখানে গিয়ে আমার নিজেকে দীনহীন বলে মনে হবে। তার থেকে ও-অনুষ্ঠানে আমার না-যাওয়াই ভালো।

তুমি কিছু টাটকা ফুলের গয়না পরতে পারো। এ বছর ফুলের গয়না পরা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাত্র দশ ফ্রাঁ দিয়ে তুমি খুব ভালো ভালো দু-তিনটে গোলাপ পেতে পারো।

তবু তৃপ্ত হল না তার মন। মাদাম লয়সেল অতৃপ্তির সুরে বলল: ধনী মেয়েদের সমস্ত বেশভূষার মধ্যে এক দৈন্য-দারিদ্র্যের ছাপ নিয়ে যাওয়ার মতো অপমানের আর কিছু হতে পারে না।

লয়সেল তখন বলে উঠল: তুমি কী বোকা! তুমি তোমার বান্ধবী মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছ থেকে কিছু গয়না ধার চাও না। তুমি তো তাকে ভালোভাবেই চেনো।

আনন্দে চিৎকার করে উঠে সে বলল : হ্যাঁ, এ-কথাটা আমার মনেই হয়নি।

পরের দিন সে তার বান্ধবীর কাছে গিয়ে সমস্যার কথাটা বুঝিয়ে বলল। মাদাম ফরেস্টিয়ার তখন তার সিন্দুক থেকে একটা গয়নার বাক্স এনে মাদাম লয়সেলের সামনে নামিয়ে রাখল। বলল: তোমার যা খুশি নাও।

মাদাম লয়সেল দেখল কতগুলো তাগা, একটা মুক্তোর হার, আর সোনা ও মণি দিয়ে তৈরি একটা ভেনিসীয় ক্রস। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে এইসব গয়নাগুলোর একটা একটা করে প'রে তাকে কেমন মানায় তা পরীক্ষা করে দেখল। তারপর ইতস্তত করতে লাগল। কিন্তু সেগুলো নিয়ে যাবার কোনো উৎসাহ পেল না। সে প্রশ্ন করল: তোমার আর কিছু নেই?

'হ্যাঁ আছে। তুমি নিজে বেছে নাও তোমার পছন্দমতো!' এই বলে আরো গয়না দেখাল মাদাম ফরেস্টিয়ার। অবশেষে একটা কালো মখমলের বাক্স থেকে একটা অতি সুন্দর হিরের হার বেছে নিল মাদাম লয়সেল। একটা উত্তাল কামনায় দুলে উঠল তার বুকটা। কম্পিত হাতে হারটা তুলে নিয়ে গলায় প'রে আয়নাতে নিজের প্রতিফলনটার দিকে তাকিয়ে রইল উল্লসিত হয়ে। তারপর ভয়ে ভয়ে সংশয়কাতর কণ্ঠে বলল: তুমি এই হারটা আমায় ধার দেবে একবার, আর আমি কিছুই চাই না।

: হ্যাঁ, নিশ্চয় দেব।

তার বান্ধবীর গলাটা জড়িয়ে ধরে আবেগের সঙ্গে চুম্বন করল তাকে। তারপর হারটা নিয়ে চলে গেল।

অনুষ্ঠানের দিন রাত্রিবেলায় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল মাদাম লয়সেলের। সেই সুন্দর গাউন আর হিরের হারটা পরে নিমন্ত্রণবাড়িতে যেতেই সবাই তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে সে-ই ছিল সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। আনন্দের উচ্ছ্বাসে মাথাটা তার ঘন ঘন দুলছিল। অনেকেই তার দিকে উৎসুক হয়ে তাকাচ্ছিল, অনেকে তার নাম জানতে ও তার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছিল। তার স্বামীর সহকর্মীরা তার সঙ্গে নাচতে চাইছিল। এমনকি স্বয়ং মন্ত্রীর দৃষ্টিও আকর্ষণ করল সে।

তার রূপের গর্বে গর্বিত হয়ে ও তার লাবণ্যের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে নাচ শুরু করে দিল মাদাম লয়সেল। আসলে সে যেন নাচছিল না; যে প্রশংসা যে শ্রদ্ধা সে সকলের কাছ থেকে লাভ করেছে, যে কামনা সে পাঁচজন মানুষের মনে জাগিয়েছে, নারীজীবনের যে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে, সেই সবকিছুর সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা এক সুখকর স্বপ্নের দুরন্ত দুর্বার উত্তেজনায় তার গোটা দেহটা যেন আপনা থেকে দুলছিল।

প্রায় রাত চারটা নাগাদ সে নাচ শেষ করল। মাঝরাত থেকেই তার স্বামী ঘুমে ঢুলছিল। তার সঙ্গে ছিল আরো তিনজন লোক—যাদের স্ত্রীরাও তার সঙ্গে সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিল।

নাচের পোশাকটা উপর থেকে খুলে ফেলতেই তার কমদামি অতিসাধারণ আটপৌরে পোশাকটা বেরিয়ে পড়ল। মাদাম লয়সেল লজ্জায় সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নামতে লাগল। লয়সেল তাকে থামাবার চেষ্টা করল। বলল: থামো, একটা গাড়ি ডেকে আনছি। তা না হলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

মাদাম লয়সেল শুনল না, তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল। তারা বড় রাস্তায় গিয়ে দেখল কোনো গাড়ি নেই। কোনো গাড়ি না-পেয়ে সেন নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে ঘাটের কাছে পুরনো একটা গাড়ি দেখতে পেল, যে-ধরনের গাড়ি দিনের বেলায় সাধারণত বার হয় না। দিনের আলোয় যারা তাদের দৈন্য লোকচক্ষে প্রকাশ করতে চায় না।

বাড়ি পৌঁছে তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। লয়সেল ভাবতে লাগল, কাল সকাল দশটায় তাকে অফিসে যেতে হবে।

মূল্যবান বেশভূষায় সজ্জিত নিজের সুন্দর চেহারাটার দিকে শেষবারের মতো একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাকাল মাদাম লয়সেল। কিন্তু সহসা চিৎকার করে উঠল। হিরের সেই হারটা তার গলায় আর নেই।

তার স্বামী পোশাক খুলতে খুলতে বলল, কী হল?

ভয়ে আমতা আমতা করে বলল মাদাম লয়সেল: আমি—আমি—মাদাম ফরেস্টিয়ারের নেকলেসটা হারিয়েছি।

'কী! হারটা হারিয়েছে? অসম্ভব, তা কখনও হতে পারে না।' লয়সেল চমকে উঠল।

তারা তাদের পোশাক আর পকেটগুলো ভালো করে খুলে দেখল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না নেকলেসটা। লয়সেল জিজ্ঞাসা করল তার স্ত্রীকে: আচ্ছা নাচঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসো তখন নেকলেসটা তোমার গলায় ছিল সেটা ঠিক মনে আছে? এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?

: হ্যাঁ, আমার মনে আছে, শিক্ষাদপ্তরের অফিসের লবিতেও নেকলেসটা আমার গলায় ছিল।

: কিন্তু তুমি যদি রাস্তায় এটা হারাতে তাহলে তার পড়ার শব্দ শুনতে পেতাম। কিন্তু সে-শব্দ আমরা পাইনি। সুতরাং এটা নিশ্চয় আসার সময় ঘোড়ার গাড়িতে পড়ে গেছে।

: হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। তুমি গাড়িটার নম্বর নিয়েছ?

: না। তুমি নিয়েছ?

: না।

তারা হতবুদ্ধি হয়ে পরস্পরের মুখপানে তাকাল। অবশেষে লয়সেল আবার পোশাক পরে বলল, যে-রাস্তাটা আমরা হেঁটে এসেছি আমি সেই গোটা রাস্তাটা খোঁজ করব। দেখি পাওয়া যায় কিনা।

লয়সেল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বিছানায় শুতে যেতে পারল না মাদাম লয়সেল। সে তখন রাতের গাউনটা পরে একটা চেয়ারে হতাশ হয়ে বসে রইল। ঘরে আগুন জ্বালার পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা করল না।

পরদিন বেলা সাতটা নাগাদ তার স্বামী ফিরে এল। হারটা পাওয়া যায়নি। লয়সেল বহু খোঁজ করল। পুলিশে খবর দিল, খবরের কাগজে পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিল, ঘোড়ার গাড়ির অফিসগুলোতে খোঁজ নিল। যে-কোনো জায়গায় একটু আশা পেলেই ছুটে গেল সেখানে। এই আকস্মিক ঘোর বিপদের আঘাতে অভিভূত ও বিহ্বল হয়ে তার স্ত্রী সারাদিন বসে রইল। সারাদিন খোঁজাখুঁজির পর ব্যর্থ হয়ে সন্ধের সময় বাড়ি ফিরে এল লয়সেল। সে তখন তার স্ত্রীকে বলল: তুমি তোমার বন্ধুকে লিখে দাও নেকলেসটার একটা কড়া ভেঙে গেছে এবং সেটা তুমি মেরামত করাচ্ছ। তাহলে আমরা ভাববার কিছু সময় পাব।

এইমতো তার বান্ধবীকে একখানা চিঠি লিখে দিল মাদাম লয়সেল।

এক সপ্তা কেটে গেল। তারা সব আশা ছেড়ে দিল। দুশ্চিন্তায় লয়সেলের বয়স পাঁচ বছর বেড়ে গেল। অবশেষে লয়সেল বলল: ওটা তাহলে আমাদের কিনে দিতে হবে।

পরের দিন হারিয়ে যাওয়া নেকলেসের খাপটা নিয়ে তারা এক গয়নার দোকানে গেল। বাক্সটার ঢাকনায় এই দোকানেরই নাম লেখা ছিল। লয়সেল ভাবল এই দোকানেই সেই ধরনের হিরের নেকলেস কিনতে পাওয়া যাবে অথবা তৈরি করানো যাবে। ডিজাইনের বইটা উল্টে-পাল্টে দেখে লয়সেল কিন্তু সেই হারানো নেকলেসটার ঢঙের কোনো নমুনা দেখতে পেল না। দোকানদার বলল: এ নেকলেস আমার দোকান থেকে কেনা হয়নি। আমি শুধু বাক্সটা দিয়েছিলাম।

তখন তারা একটার-পর-একটা করে অনেকগুলো গয়নার দোকান ঘুরল। যে নেকলেসটা হারিয়েছে ঠিক সেই রকমের একটা হিরের নেকলেসের খোঁজ করতে লাগল তারা। কিন্তু কোথাও তা পেল না। দুঃখে ও হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল দু'জনেই।

অবশেষে প্যালে-রয়াল এলাকায় একটা গয়নার দোকানে একটা হিরের নেকলেস দেখতে পেল যেটা দেখতে অবিকল সেই হারানো নেকলেসটার মতো। তার দাম হচ্ছে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। অনেক ধরাধরির পর দোকানদার সেটা ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁ-তে দিতে রাজি হল। তারা দোকানদারকে সেটা

তিনদিন বিক্রি না করে রেখে দেবার জন্য অনুরোধ করল। তারা আরো অনুরোধ করল ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি হারানো নেকলেসটা কোনোক্রমে খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে যেন এই দোকানদার তাদের কাছ থেকে নেকলেসটা চৌত্রিশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে আবার কিনে নেন।

পৈতৃক ধন হিসেবে লয়সেলের কাছে মোট সঞ্চয় ছিল আঠারো হাজার ফ্রাঁ। বাকি টাকাটা সে ধার করার কথা ভাবল। জানাশোনা সব জায়গা থেকে সে ধার করতে শুরু করে দিল। কোনো জায়গায় এক হাজার ফ্রাঁ, কোনো জায়গায় পাঁচশো ফ্রাঁ, এখানে পাঁচ লুই, ওখানে পাঁচ লুই, ওখানে তিন লুই। মহাজনদের কাছ থেকে চড়াসুদে টাকা ধার করল। যেখানে-সেখানে যে-কোনো শর্তে রাজি হয়ে সে সই করতে লাগল। অথচ সে বেশ ভালোই জানত, সেসব শর্ত পালন করা সম্ভব না তার পক্ষে। কৃষ্ণকুটিল যে দুঃখকষ্ট, যে মনোবেদনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে তার কথা ভাবতে ভাবতে দোকানে গিয়ে নেকলেসটা আনতে গেল লয়সেল। দোকানের কাউন্টারে নগদ ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁ গুণে দিল।

মাদাম লয়সেল তার বান্ধবী মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছে হারটা নিয়ে গেলে মাদাম ফরেস্টিয়ার বলল: এটা তোমার আরো আগে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমি পরতে পারতাম।

তবে যাই হোক, একটা দিকে নিশ্চিন্ত হল মাদাম লয়সেল। মাদাম ফরেস্টিয়ার বাক্সটা খুলে নেকলেসটা দেখল না। দেখে যদি বুঝতে পারত এটা সেই নেকলেস নয়, পাল্টে দেওয়া হয়েছে তাহলে নিশ্চয় মাদাম লয়সেলকে চোর বলে মনে করতেন।

এবার দিনে দিনে নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে লাগল মাদাম লয়সেল। মনটাকে শক্ত করে সে সাহসের সঙ্গে সবকিছু সহ্য করে যেতে লাগল। ভালো ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে তারা ব্যারাক-বাড়িতে গিয়ে বাসা নিল, ঝি-কে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। রান্না ও বাড়ির যাবতীয় সব কাজ সে নিজেই করতে লাগল। খাওয়ার পর বাসনপত্র সে নিজেই ধুতো আর তা ধুতে গিয়ে গোলাপি নখপালিশ লাগানো হাতের নখগুলো তেলকালিতে ভরে যেত। সে নিজের হাতে তাদের পোশাকগুলো কেচে শুকোতে দিত। রোজ সকালে সে সদর-দরজা পর্যন্ত ঝাঁট দিত এবং নিচে থেকে জল তুলত। জল নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় হাঁপিয়ে উঠে নিশ্বাস নেবার জন্য থামত মাঝে মাঝে। কলকারখানার কোনো মহিলা-শ্রমিকের মতো সে ঝুড়ি নিয়ে তরকারির দোকান ও মুদির দোকানে যেত। সামান্য একপয়সার জন্য দরকষাকষি করত। প্রতি মাসেই সময় নেবার জন্য বন্ধকী চুক্তিগুলো নতুন করে পাল্টে করতে হত। তার স্বামীও সন্ধ্যার সময় আর এক জায়গায় কাজ করত। রাত জেগে লেখা নকল করে দিয়েও পাতাপিছু পাঁচ লুই করে রোজগার করত।

এইভাবে দশ বছর চলল। এই দশ বছরের মধ্যে একে-একে-সুদে আসলে সব ঋণ শোধ করে দিল তারা। মাদাম লয়সেল এখন কেমন যেন বুড়ি হয়ে গেছে। তার মাথার চুল অবিন্যস্ত, পোশাক-পরিচ্ছদ মলিন এবং অগোছালো, হাতগুলো তামাটে—তাকে এখন দেখলেই গরিবলোকের দীনহীন স্ত্রী বলে মনে হয়। তার গলার স্বরটাও এখন আর তেমন শান্ত ও নরম নেই। তবে তার স্বামী যখন বাড়ি থাকে না তখন অবকাশ পেলেই সে জানালার ধারে বসে সেই সুদূর অতীতের একটি উজ্জ্বল সন্ধ্যার কথা ভাবে, সেই সন্ধ্যার কথা—যখন তার নারীদেহের রূপসৌন্দর্য চরম গৌরব লাভ করে। আরো ভাবে, সে যদি নেকলেসটা তখন না-হারাত তাহলে তার পরিণতি কী হত, ঘটনার স্রোত তাকে কোথায় নিয়ে যেত কে বলতে পারে? জীবনের গতিপথ কত পরিবর্তনশীল, কত কুটিল! সামান্য ছোট্ট একটা ঘটনা মানুষের জীবনকে একেবারে ধ্বংস অথবা সরস করে দিতে পারে।

এক রবিবার সারা সপ্তার হাড়ভাঙা খাটুনির পর শ্যাম্প এলিসির দিকে একটু বেড়াতে গেল মাদাম লয়সেল। ঘুরতে ঘুরতে একটি শিশুকোলে এক মহিলাকে দেখতে পেল সে। সে দেখে চিনতে পারল। মহিলাটি মাদাম ফরেস্টিয়ার। মাদাম ফরেস্টিয়ার আগেকার মতো তেমনই সুন্দরী আছে, তার যৌবন অক্ষত রয়ে গেছে। অজানা আবেগানুভূতির একটা শিহরণ খেলে গেল মাদাম লয়সেলের মধ্যে। সে কি কথা বলবে তার বান্ধবীর সঙ্গে? কেন বলবে না? তাদের সব ঋণ তো শোধ হয়ে গেছে। এবার সে তাকে তাদের দুঃখের সব কাহিনী বলতে পারে। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছে। বলল: কেমন আছ জিয়ান?

তার বান্ধবী কিন্তু তাকে চিনতে পারল না। এইরকম একজন সাধারণ মহিলা তার নাম ধরে ডাকায় সে আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল: আমি তোমায় চিনতে পারছি না, মনে হয় তুমি ভুল করছ!

: না। আমি মাদাম লয়সেল।

এবার বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল মাদাম ফরেস্টিয়ার। ও, তুমি মাফিলদে, কত বদলে গেছ তুমি!

: হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পর থেকে আমি অশেষ অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের মধ্যদিয়ে জীবন কাটাচ্ছি আর সে-দুঃখ এসেছে তোমারই মাধ্যমে।

: আমার মাধ্যমে? কী বলছ তুমি?

: তোমার সেই হিরের নেকলেসটার কথা মনে আছে? শিক্ষাদপ্তরের সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য তুমি আমায় যেটা ধার দিয়েছিলে?

: হ্যাঁ। কিন্তু তারপর?

: সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

: আমি তা জানি না। তুমি তো আমায় সেটা ফেরত দিয়ে গেছ।

: আমি যেটা তোমায় দিয়েছি সেটা তারই মতো একটা কিনে এনে দিয়েছি। আর সেই টাকাটা আমি গত দশ বছর ধরে অতিকষ্টে শোধ করে আসছি। তুমি বেশ বুঝতে পারছ আমাদের মতো লোকের—যাদের একটা পেনি নেই ঘরে, তাদের পক্ষে এ-কাজ কত কঠিন। যাই হোক, ব্যাপারটা এবার সব চুকে গেছে। এখন আমি কত স্বস্তি যে পেয়েছি তা কী করে তোমাকে বলব!

মাদাম ফরেস্টিয়ার কথাটা শুনে সবকিছু বুঝতে পেরে পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল। তারপর বলল: তুমি বলছ, সেটার বদলে তুমি একটা আসল হিরের নেকলেস কিনে এনে দিয়েছ আমায়?

'হ্যাঁ, তুমি তা দেখনি? দুটো নেকলেসই কিন্তু দেখতে এক।' এক সূক্ষ্ম তৃপ্তি আর অহঙ্কারের হাসি হাসল মাদাম লয়সেল।

মাদাম ফরেস্টিয়ার তখন তার বান্ধবীর হাতদুটো দুঃখের আবেগে জড়িয়ে ধরে সকরুণ কণ্ঠে বলল: হায়, প্রিয় বেচারি মাফিলদে, আমার নেকলেসটা ছিল নকল, তার দাম বড়জোর পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।

রিউনোসুকে আকুতাগাওয়া
নরকচিত্র

জাপানের ইতিহাসে মহিমান্বিত হরিকাওয়াই ছিলেন সবচেয়ে বড় সম্রাট। জাপানের পরবর্তী বংশধরদের এতবড় সম্রাট দেখার সৌভাগ্য কোনোদিনই হবে না। প্রবাদ আছে, তাঁর জন্মের পূর্বে, দেবতা দায়তোকুমিয়ো-ও স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন সম্রাজ্ঞী-মাতাকে। জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ। আর তিনি যা করতেন সবই ছিল সাধারণের কল্পনার অতীত। কয়েকটি ছোট্ট উদাহরণ দিলেই সবকিছু স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে, যেমন হরকাওয়া প্রাসাদের সাবলীল, সুঠাম গঠনরীতি এবং তার বিলাসবহুল ঐশ্বর্য আমাদের নগণ্য ধারণায় অসম্ভব। স্বভাব-চরিত্রে তিনি নাকি চীনের 'প্রথম সম্রাট' ও 'সম্রাট ইয়াং'-এর সমকক্ষ ছিলেন। অবশ্য এ তুলনা অনেকখানি অন্ধের হাতি দেখার মতো। কারণ, তিনি কোনোদিনই গৌরবে এবং বিলাসবাহুল্যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব চাননি। তাঁর মনুষ্যত্ব ছিল বিশাল বরং তিনি তাঁর আনন্দ সবসময় ভাগ করে নিতে চাইতেন প্রজাদের সঙ্গে।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখে অভাবনীয় বীভৎস আর নৃশংস দৃশ্যের অবতারণা করেও তাঁর মতো এতবড় শাসকের অক্ষত অবস্থায় টিকে থাকা সম্ভব হয়েছিল, শুধু এ-জন্যই। তাছাড়া পটে আঁকা ছবির মতো 'শিয়ো গামা'র অত সুন্দর দৃশ্যের অনুকরণে তৈরি তাঁর প্রাসাদ-কানন থেকে 'মন্ত্রী বামে'র প্রেতাত্মা-সৃষ্ট নিশীথ-ভীতি দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর এই দুঃসাহসিক ক্ষমতা ছিল বলেই।

সত্যি, হরিকাওয়ার প্রভাব এত প্রখর ছিল যে, কিয়োটোর প্রতিটি লোক, কি যুবা কি বৃদ্ধ, তাঁকে ভক্তি করত এমনভাবে, মনে হত যেন তিনি জীবন্ত বুদ্ধ।

একবার রাজদরবারে চেরিফুলের প্রদর্শনী শেষ করে ফেরার পথে তাঁর গাড়ির একটা ষাঁড় জোয়াল ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে পথচারী এক বৃদ্ধকে আঘাত করে। প্রবাদ আছে, এমন দুর্ঘটনার পরেও বৃদ্ধ ভক্তিভরে জোড়হাতে দাঁড়ায় এবং মহামহিম সম্রাটের ষাঁড় যে তাকে আঘাত করেছে এ-জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তাঁর জীবন ছিল এমনি স্মরণীয় কীর্তিতে ভরা—যা স্বচ্ছন্দে উত্তরপুরুষকে হস্তান্তরিত করা যেত। কোনো এক রাজকীয় ভোজে তিনি তিরিশটি শাদা ঘোড়া

উপহার দেন। একবার যখন প্রধান সেতুর নির্মাণকাজ ব্যাহত হচ্ছিল, তখন তিনি দেবতার রোষ শান্ত করার জন্য, তাঁর অন্যতম বালকভৃত্যকে দিয়ে বানিয়েছিলেন মানুষের থাম। বেশ কয়েক বছর আগে তাঁর একজন চীনা পুরোহিত ছিল, সে একজন বিখ্যাত চীনা চিকিৎসাবিদের চিকিৎসাপদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল, তাকে দিয়ে তিনি তাঁর নিতম্বের ফোঁড়া কাটিয়েছিলেন। এমন সব ঘটনাবলি, যা বর্ণনা করা রীতিমতো দুষ্কর। কিন্তু এ-সব ঘটনাও অর্থহীন, ম্লান হয়ে যায় রাজকীয় কোষাগারে রক্ষিত নৃশংস নরকচিত্র সৃষ্টির ইতিহাসের কাছে। এমনকি যে মহামহিম প্রভুর স্থিতবুদ্ধি কোনো অবস্থাতেই চঞ্চল হয়নি, তিনিও কোনো-এক অস্বাভাবিক আঘাতে অসাড় হয়ে গেছিলেন। শুধু তাই নয়, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল তাঁর পরিচারকবৃন্দ। বিশ বছর ধরে আমিও তাঁর সেবা করে আসছি, কিন্তু এমন ভীতিকর দৃশ্য দেখিনি।

কিন্তু গল্পটা বলার আগে, এই বীভৎস ভয়ংকর নরকচিত্রের যে শিল্পী সেই য়োশিহাইদ সম্পর্কে কিছু বলব।

২১

কিছু লোক এখনো মনে রেখেছে য়োশিহাইদকে। সে এতবড় শিল্পী ছিল যে সমসাময়িক কেউই তার সমকক্ষ ছিল না। যে ঘটনা আমি বলতে চলেছি, তা যখন ঘটে তখন তার বয়স পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে। অস্থিচর্মসার এই বৃদ্ধ তখন বয়সের ভারে বিপর্যস্ত, আকৃতি কদাকার। সম্রাটের দরবারে কখনো এলে পরনে থাকত ফুলের পাপড়ি দিয়ে রং-করা শিকারির পোশাক, মাথায় নরম টুপি। স্বভাবের দিক থেকে ছিল হীনতম, আর ছিল বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিক তরুণ দুটি লাল ঠোঁট। এতে আচমকা মনে হত লোকটা ক্রূর, পশু-মনোবৃত্তির অধিকারী। কেউ কেউ বলত, ঠোঁট লাল হওয়ার কারণ হচ্ছে রঙের তুলি চাটার জন্য, অবশ্য এটা সত্য কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল আমার। দুষ্টুলোকেরা বলত তার আকৃতি এবং প্রকৃতি দুটোই বানরের মতো, আর তাই তার নাম রেখেছিল 'সারুহাইদ' বা ছদ্মবেশী বানর।

এই সারুহাইদের ছিল পনেরো বছরের একটিমাত্র মেয়ে। সম্রাটের প্রাসাদে সম্রাজ্ঞীর পরিচারিকা হিসেবে সে তখন ছিল। সে ছিল বাবার ঠিক বিপরীত—কমনীয় ও অপূর্ব সুন্দরী। অল্পবয়সে মাকে হারিয়ে মেয়েটি হয়ে উঠেছিল অকালপক্ব, তবে সে ছিল বুদ্ধিমতী এবং বয়সের তুলনায় অনেক জ্ঞানী। এইভাবে সে হয়েছিল সম্রাজ্ঞীর স্নেহের পাত্রী এবং সমগোত্রীয়দের প্রিয়।

ঠিক এই সময়ে টোকিওর পশ্চিমে তানবা প্রদেশ থেকে সম্রাটকে একটি বানর উপহার দেওয়া হয়। চঞ্চলমতি ছোট রাজকুমার তার নাম রাখেন 'য়োশিহাইদ।'

হাস্যকর এই জীবটার সঙ্গে নামটার এমন এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিধান হল যে, প্রাসাদের প্রতিটি মানুষের হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য, এটুকু হলেই কেউ কিছু মনে করত না। পক্ষান্তরে সে যখন বাগানে পাইনগাছ বেয়ে উপরে উঠত অথবা ছোট রাজকুমারের মেঝে নোংরা করত, তারা তাকে ঐ নামে বিদ্রূপ করত, গালাগালি করত।

একদিন য়োশিহাইদের মেয়ে, য়ুজুকি, টানা-বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল, হাতে ছিল তার বেগুনি রঙের ফুলের ঝারি আর সঙ্গে একটা চিঠি, সে-সময়ে তার চোখের পড়ল বানরটাকে, ছুটে আসছে দরজার ওপাশ থেকে। মনে হল আহত, ফলের গাছ বেয়ে ওঠার চির-অভ্যস্ত উৎসাহের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তার ভাবভঙ্গিতে বোঝা গেল যে তার একটা পায়ে সত্যি লেগেছে। তখন কাকে আর ডাকা যায় ভাববার আগেই দেখা গেল চাবুক-হাতে ছোট রাজকুমারকে, ছুটে আসছেন আর ধমকাচ্ছেন, 'থাম্, বেহায়া তস্কর, থাম্, থাম্!' এ দৃশ্য দেখে সে শুধু একমুহূর্ত ইতস্তত করল। ঠিক তখনই বানরটা আর্তনাদ করে তার কিমোনোর তলায় আশ্রয় নিল। সেই মুহূর্তেই করুণার্দ্র হয়ে উঠল তার অন্তর। একহাতে ঝারিটা ধরে অন্যহাতে তার নম্র উজ্জ্বল কালো রঙের কিমোনোর বাঁধন খুলে সোহাগভরে তাকে তুলে নিল কোলে।

'আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, প্রভু', মধুর স্বরে সে বলল, শ্রদ্ধাবনত অভিবাদন জানাল রাজকুমারকে, 'এ তো অতি নগণ্য একটি জীব, একে ক্ষমা করুন, প্রভু!'

'তুমি ওকে বাঁচাচ্ছ কেন?' অসন্তুষ্ট হয়ে তাকিয়ে, দু-তিনবার মাটিতে পা ঠুকলেন রাজকুমার, 'বানরটা একটা আস্ত বেহায়া চোর, শুনে রাখো।'

'ও তো একটা জানোয়ার মাত্র, প্রভু', পুনরুক্তি করল সে।

তারপর সরল কিন্তু বিষণ্ন একটা হাসি হেসে বেশ সাহসের সঙ্গে বলল, 'য়োশিহাইদ, এই ডাক শুনেই আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, মনে হল, কেউ যেন আমার বাবাকেই বকছে।' এ-কথা শুনে ভীষণ এক দুষ্টুমিতে রাজকুমারের মন ভরে গেল।

'আচ্ছা', নিস্পৃহ স্বরে তিনি বললেন, 'তোমার বাবার জন্যই যখন বলছ, আমি ওকে বিশেষ ক্ষমাই করলাম।'

তারপর চাবুকটা ফেলে দিয়ে, যে-পথ দিয়ে এসেছিলেন, সে-পথ দিয়েই ফিরে গেলেন।

৩

সেদিন থেকে মেয়েটি আর বানরটি হয়ে দাঁড়াল পরস্পরের পরম বন্ধু। জন্তুটির গলায় বেঁধে দিল সুন্দর রঙিন ফিতে আর ওতে ঝুলিয়ে দিল রাজকুমারীর দেওয়া

সোনার ঘণ্টা। জন্তুটা এরপর থেকে তাকে ছেড়ে আর যেত না কোথাও। মেয়েটি একবার ঠাণ্ডা লেগে বিছানায় পড়ে থাকে। খুদে বানরটা তখন সারাক্ষণ বসে থাকত তার বিছানার পাশে, তাকে লক্ষ করত চিন্তা-কাতরভাবে আর দুঃখে নিজেকে আঁচড়াতে থাকত নখ দিয়ে।

এরপর শুনতে হয়তো আশ্চর্য লাগবে, সেই থেকে বানরটাকে কেউ আর গাল দিত না বা বিদ্রূপ করত না। বরং ব্যাপারটা হল উল্টো, সবাই তাকে আদর করতে শুরু করল। এমনকি ছোট রাজকুমারও তাকে কুল অথবা বাদাম ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন। একবার একজন সৈনিক তাকে লাথি মারে আর সেটা তাঁর চোখে পড়ে যায়, এতে তিনি ভয়ানক রেগে গেছিলেন। সম্রাটের কানে এ খবর পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেয়েটিকে হাজির হতে বললেন বানরটিকে কোলে করে। এ ঘটনার সঙ্গে এটাও নিশ্চয় তাঁর কানে গেছিল যে কী করে বানরটা তার এত পোষ মেনেছিল।

'তুমি খুব ভালো আর কর্তব্যপরায়ণা, তোমার ব্যবহারে আমি খুব খুশি হয়েছি', বললেন সম্রাট আর পুরস্কার হিসেবে উপহার দিলেন রক্তবর্ণের একটি পোশাক। মেয়েটির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গিটি অনুকরণ করে বানরটাও অভিবাদন করল সম্রাটকে, আর পোশাকটা তুলে ছোঁয়াল মাথায়, অপরিমেয় আনন্দ লাভ করলেন সম্রাট, সন্তুষ্ট হলেন। অবশ্য স্মরণ রাখা দরকার, যে প্রীতি দিয়ে মেয়েটি বানরটাকে তার অনুগত করে নিয়েছিল, তারই জন্য সন্তুষ্ট হয়ে অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন সম্রাট, নারীর পূজারি হিসেবে নয়, যদিও গুজবে অনেক কিছুই শোনা যায়। এ গুজবের পেছনে ছিল অনেকগুলো সঙ্গত কারণ, তবুও এ বিষয়ে সময় পেলে পরে আমি কিছু বলতে চেষ্টা করব। এখন আমার আলোচনা এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাক যে সম্রাট আর যা-ই হন—আঁকিয়ের মেয়ের মতো, এত নিচু স্তরের একটা মেয়ের প্রেমে পড়ার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না, সে মেয়ে যতই সুন্দরী হোক-না কেন।

অতীব সম্মানিত হয়ে মেয়েটি ফিরে এল রাজদরবার থেকে। এমনিতে সে ছিল জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমতী তাই এমন কিছু সে করল না যার ফলে তার কুৎসাপরায়ণ সঙ্গিনীদের হিংসার উদ্রেক করে। বরং সে এবং বানর উভয়েই তাদের কাছ থেকে পেল পরম প্রীতি এবং প্রতিপত্তি। সে রাজকুমারীর অনুগ্রহ লাভ করল এত বেশি যে, তাকে ছাড়া থাকত না রাজকুমারী, আর সঙ্গিনী হিসেবে সে তাঁর ভ্রমণে অংশ নিতে বাদ পড়ত না।

এখন মেয়েটির কথা কিছুক্ষণ থাক, তার বাবা য়োশিহাইদের কথাই বলি। যদিও বানর য়োশিহাইদকে এখন সবাই শুরু করেছে ভালোবাসতে, কিন্তু শিল্পী য়োশিহাইদকে সবাই আগের মতোই ঘৃণা করে আর আড়ালে-আবডালে বিকৃত 'সারুহাইদ' নামেই ডাকে।

য়োকাওয়া মন্দিরের পুরোহিত তাকে এমন ঘৃণাই করত যেন সে আস্ত একটা শয়তান। শুধু তার নাম শোনামাত্রই সে ক্ষোভে-দুঃখে কালো হয়ে যেত। কেউ কেউ বলত এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে, পুরোহিতের চরিত্র বিশ্লেষণ করে একটা ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকেছিল য়োশিহাইদ। অবশ্য এটা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত একটা গুজবমাত্র ছিল, বাস্তবে এর ভিত্তি না-ও থাকতে পারে। যাই হোক, পরিচিতদের মধ্যে সে ছিল বড্ড অপ্রিয়। তার সম্পর্কে যারা বদনাম করত না, এ-রকম ছিল মাত্র কয়েকজন, এদের মধ্যে দু-তিনজন ছিল তার সহকর্মী শিল্পী অথবা যারা তার অঙ্কন দেখেছে কিন্তু তার চরিত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ।

সত্যি তার চেহারাটা শুধু জঘন্য ছিল না, তার কতকগুলো কুৎসিত অভ্যাসের জন্য সবার কাছে সে ছিল ঘৃণিত, অবহেলিত। এর জন্য কাউকে তার দোষ দেওয়ার ছিল না, একমাত্র নিজেকে ছাড়া।

৪

এখন আমি বর্ণনা করব তার আপত্তিকর অভ্যাসগুলো। সে ছিল ক্রূর, কর্কশ, নির্লজ্জ, অলস আর কামুক। এর মধ্যে জঘন্যতম ছিল তার রূঢ় এবং একরোখা ভাব, ফলে জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হয়েও তাকে লাঞ্ছিত হতে হত সবসময়। তার এ ঔদ্ধত্য শুধু যদি আঁকার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকত, তবে হয়তো আপত্তির কিছু থাকত না। এছাড়াও তার অহংকার এত বেশি ছিল যে, জীবনের প্রচলিত রীতিনীতি, সংস্কার সবকিছুর সম্পর্কেই তার একটা তীব্র ঘৃণাবোধ সদাজাগ্রত ছিল।

তার অধীনে একজন দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষানবিশি করে, তারই বর্ণিত একটি কাহিনী বলছি। কোনো জমিদারের প্রাসাদে, প্রেতাত্মার অভিশাপে একজন স্বনামখ্যাত 'মধ্যম' চেতনালুপ্ত হয়ে পড়ে এবং ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী করে। শিল্পী সে বাণীর দিকে অযথা কর্ণপাত না করে, হাতের মাথায় যে রং এবং তুলি পেল তাই দিয়ে মধ্যম ভদ্রমহিলার তৎকালীন বীভৎস আকৃতির ছবিটা এঁকে ফেলে। ছেলেদের খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি তার কাছে ঐ প্রেতাত্মার অভিশাপ।

তার স্বভাবই এমনি ছিল যে, স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত কোনো নারীর ছবি এঁকে সঙ্গে সঙ্গেই আঁকতে পারত কোনো বেশ্যার, অথবা অগ্নিদেবতার ছবির পরেই কোনো ক্লেদাক্ত বদমাশের। এমনি বহু অপকীর্তিই সে করেছিল। তার বিচার বসলে নির্দ্বিধায় সে বলে, 'তোমাদের কথা শুনলেই আশ্চর্য লাগে, যে দেবতার আর বুদ্ধের ছবি এঁকেছি তাঁরা তার শিল্পীকে শাস্তি দিতে সক্ষম হবে মনে হয় না।' এতে তার শিক্ষানবিশদের অনেকেই এমন চমকে উঠে যে, ভয়ংকর কিছু ঘটনার ভয়েই তারা তার কাছ থেকে বিদায় নেয়। যাই হোক, সে ছিল জীবন্ত ঔদ্ধত্য, নিজেকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে সে বড় মনে করত না।

শিল্পী হিসেবে নিজেকে সে কত বড় মনে করত তা যে-কেউ বুঝতে পারবে। তার অঙ্কনরীতি, তুলির টান আর রঙের ব্যবহার ছিল সবার চেয়ে আলাদা, তারই সমসাময়িক যাদের সঙ্গে তার মনের মিল ছিল না তারা তাকে আখ্যা দিয়েছিল ব্যভিচারী। তারা গল্প করত 'কাওয়ানারি' ও 'কানাওক'—অতীতের দু'জন বিখ্যাত শিল্পীর সম্পর্কে এবং আরো অনেক নামকরা শিল্পী, যাদের চিত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল সুন্দর সুন্দর কাহিনী। এমন প্রবাদ আছে যে, পূর্ণিমারাতে ফোটা ফুলের হালকা মিষ্টি গন্ধ আর চিত্রে আঁকা দরবারের সংগীতকারের বাঁশির সুর শোনা যায়। কিন্তু য়োশিহাইদের সব চিত্রই ছিল মাধুর্যবর্জিত, বিসদৃশ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, রিয়োগাই মন্দিরের তোরণে আঁকা পাঁচটি স্তরে আত্মার রূপান্তরের সেই চিত্রটি সম্পর্কে—গভীর রাতে এখান দিয়ে গেলে হয়তো শুনতে পাওয়া যায় দেবদাসীদের দীর্ঘশ্বাস আর কান্নার শব্দ; কেউ আবার বলে গলিত দেহের পূতিগন্ধও পাওয়া যায়। সম্রাটের আদেশে দরবারের মহিলাদের ইচ্ছার চিত্ররূপ এঁকেছিল য়োশিহাইদ, সে চিত্র দেখে দুঃখে-বেদনায় কেউ তিনবছরও বাঁচেনি, মরদেহ ছেড়ে তাদের আত্মা চলে গিয়েছিল। নিন্দুক বলত, এর কারণ তার ঐ চিত্রেরই জাদুর কারবার।

তবু বলেছি, সে ছিল চরম বিকৃত উন্মাদ, আর তার অধ্যবসায় সম্পর্কে ছিল অসীম গর্ব।

একবার যখন সম্রাট তাকে বলেন, 'কদর্যতার প্রতি তোমার ভীষণ পক্ষপাতিত্ব আছে মনে হয়,' রক্তিম ঠোঁটের প্রান্তে তার বিদ্রূপ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, 'জি হুজুর, অসংস্কৃত শিল্পী কদর্যতার মধ্যে সৌন্দর্য অনুভব করতে পারে না।'

সারাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পী হলেও সম্রাটের প্রতি এতখানি রূঢ় মন্তব্য করার ঔদ্ধত্য তার কোথা থেকে এল, কেউ জানে না। এ ঔদ্ধত্যকে বিদ্রূপ করে তার শিক্ষানবিশরা তাকে গোপনে নাম দিয়েছিল 'চিরা আইজু'।

যাই হোক, য়োশিহাইদ যদিও অবর্ণনীয় বিকৃত কদাচারী ছিল, তবুও তার একটি দুর্বল দিক ছিল, যার ফলে মনে হয় মানবিক প্রেমপ্রীতি তার মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি।

৫

তার একমাত্র মেয়ে ছিল সম্রাটের পরিচারিকা হয়ে, তাকেই সে ভালোবাসত আর সে ভালোবাসাও ছিল পাগলামিরই নামান্তর। মেয়েটির স্বভাব ছিল নম্র, মধুর। সে ছিল বাবার একান্ত অনুগত। হয়তো শুনলে বিশ্বাস হবে না, উদ্‌ভ্রান্ত য়োশিহাইদ তার মেয়ের জন্য সব দিতে পারত, অথচ যে লোক বুদ্ধের মন্দিরে কোনোদিন একটা

তামার পয়সা দিত না, সে লোকই দু'হাতে টাকা উজাড় করে তার মেয়ের জন্য কিনে দিত রংদার কিমোনো, হিরের চুলের কাঁটা আর নানারকম আসবাবপত্র।

কিন্তু তার মেয়ের জন্য ভালোবাসা ছিল বাঁধনহারা, অন্ধ। জামাই হিসেবে কোনো সুন্দর ছেলের খোঁজ করার ভাবনা মনে সে আদৌ ঠাঁই দিত না, বরং কোনো ছেলে মেয়েটার দিকে আকৃষ্ট হলে, সে বিশেষ বিবেচনাসহকারে বাজারে গুণ্ডা ভাড়া করে নিঃসন্দেহে তাকে ধোলাই দেবার ব্যবস্থা করত। শুধু তাই নয়, সম্রাট তাঁর পরিচারিকা হওয়ার জন্য তার মেয়েকে যখন মহান আদেশ দিলেন, সে শির্কার মতো টক হয়ে গেল বিরক্তিতে; তার সে অসন্তুষ্টি দূর হল না, মহামান্য সম্রাটের সামনে এসেও। রটনা আছে, মেয়েটির রূপের প্রশংসা শুনে তার বাবার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সম্রাট আদেশ করেছিলেন তাকে দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্যে, অবশ্য এ পরিস্থিতির সঙ্গে যারা পরিচিত এটা তাদের উদ্ভাসিত কল্পনাও হতে পারে। গুজব যাই হোক-না কেন, কন্যাস্নেহে অন্ধ য়োশিহাইদ আপ্রাণ চেষ্টা করছিল তার মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য। একবার মহামহিমের আদেশে একটি দেবদূতের এবং সম্রাটের প্রিয়পাত্র একজন ভৃত্যের পূর্ণাবয়ব অপূর্ব ছবি সে এঁকে দিয়েছিল।

অপরিসীম আনন্দ লাভ করেন সম্রাট এবং শিল্পীকে বলেন, 'য়োশিহাইদ, আমি খুশি হয়েছি, এবং যে-কোনো পুরস্কার চাইলে তা মঞ্জুর করতে রাজি আছি।'

'সম্রাটের যখন অসীম অনুগ্রহ', চরম ধৃষ্টতার সঙ্গে সে বলে, 'আমাকে অনুমতি দান করলে আমি বলব যে, আমার কন্যাকে আপনার সেবা থেকে রেহাই দেওয়া হোক।'

রাজপরিবারের কেউ ছাড়া মহামহিম হরিকাওয়ার পরম স্নেহভাজন পরিচারক বা সারা দুনিয়ার এমন আর কারো সাহস ছিল না যে তাঁর মুখের ওপর এতবড় উদ্ধত উক্তি করে। বিরক্তির সঙ্গে, রোষকষায়িত নেত্রে প্রবল পরাক্রমশালী মহামহিম নির্বাক, নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

'না, মঞ্জুর করতে পারলাম না,' থুতু ফেলে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। এ-রকম আরো চার-পাঁচটা ঘটনা হয়তো ঘটেছে। প্রতিবারই আমার মনে হয়েছে, য়োশিহাইদের প্রতি সম্রাটের দৃষ্টিতে না ছিল কোনো করুণা, না উত্তাপ, বরং সে দৃষ্টি হয়ে উঠেছিল হিমশীতল। এসব কারণেই পিতার জন্য বেড়ে উঠেছিল কন্যার উদ্বেগ। যখন সে ফিরে যেত ঘরে, অনেক সময় ধরে কাঁদত আর আক্ষেপে কিমোনোর হাত কাটত দাঁত দিয়ে। তারপরই গুজব রটল, মহামহিম মেয়েটির প্রতি আসক্ত। কেউ কেউ আবার বলে নরকচিত্রের সবটুকু কারণের পেছনে লুকিয়ে আছে, সম্রাটের ইচ্ছাপূরণে মেয়েটির অস্বীকৃতি। আমি অবশ্য এটাকে সত্য বলে মানি না।

মেয়েটিকে বরখাস্ত না-করার কারণ হিসেবে আমাদের মনে হয়, তিনি তার পারিবারিক আবহাওয়ার কথা জেনে করুণার্দ্র হয়েছিলেন, কেননা বাবা তো তার

বিকৃত মস্তিষ্ক এবং একগুঁয়ে, তাই হয়তো সম্রাট চেয়েছিলেন মেয়েটি তারই প্রাসাদে বরং আরাম-আয়াশে থাক। অবশ্য এগুলোই কামনালোলুপ সম্রাটের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ ঘটনার এহেন বিবৃতিদান। এখন আমি বলার সাহস রাখি যে, এগুলো ছিল সবই অবান্তর এবং মিথ্যা।

যাহোক, দিনগুলো যখন এমনি অসন্তোষের মধ্যদিয়ে যাচ্ছিল, তখনই সম্রাট ডেকে পাঠালেন য়োশিহাইদকে এবং একটি পর্দায় নরকের দৃশ্য অঙ্কনের জন্য আদেশ করলেন।

৬

নরকের চিত্র এক অপূর্ব শিল্পকীর্তি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্পষ্ট, নিখুঁত, বীভৎস নরক।

প্রথমত তার অঙ্কিত নরকচিত্রের পরিকল্পনা ছিল অন্যান্য শিল্পীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নরকচিত্রের প্রথমাংশে সংক্ষিপ্ত মাপে দেখানো হয়েছিল নরকের দশজন রাজাকে, তাদের পরিবার এবং পারিষদবর্গকে আর বাকি অংশ জুড়েছিল ভয়ংকর আগুনের শিখা, উন্মুক্ত গর্জনমুখর সে শিখা পরিব্যাপ্ত করে আছে তরবারির পাহাড় এবং চাবুকের বনকে দেখে মনে হচ্ছে, ওগুলো জ্বলে উঠবে মুহূর্তমধ্যে আর রূপান্তরিত হবে হাজারো জ্বলন্ত শিখায়। অনুরূপভাবে নরকের প্রহরী ও কর্মচারীদের পোশাকের পরিকল্পনা ছিল চীনাদের মতো পীত ও নীলাভা মেশানো, তাছাড়া যেদিকেই তাকানো যায়, শুধু চোখে পড়ে প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখা, পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়া ঘুরে-ঘুরে উঠছে উপরে আর এই অগ্নিযজ্ঞ থেকে মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে আগুনের ফুলকি উপরে উঠে মিশে যাচ্ছে দগ্ধ স্বর্ণরেণুর মতো।

যে-কোনো মানুষের দৃষ্টিকে স্তম্ভিত করার পক্ষে তুলির এ কাজটুকুই যথেষ্ট ছিল। সর্বগ্রাসী নরকের আগুনের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠছে যেসব পাপী, তাদের আকৃতির সঙ্গে মিল ছিল না সাধারণভাবে আঁকা কোনো নরকচিত্রের সঙ্গে। এ চিত্রে দেখানো হয়েছে, জীবনের প্রতিটি স্তরের মানুষের এক মিছিল—ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র, রাজা, ফকির এমনকি জাতিচ্যুত 'একঘরে' পর্যন্ত; জমকালো পোশাক পরিধানে পারিষদবর্গ, বাহারের পোশাকে আবৃত সামুরাই গোষ্ঠীর ছলনাময়ী বধূবৃন্দ, ফাঁসিতে লটকানো উপাসনাপীঠে পুরোহিতের দল, উঁচু আড়কাঠিতে আটকানো সামুরাই ছাত্রের দঙ্গল, মনোহারী বিচিত্র পোশাকে নারীগণ, শিন্টো পুরোহিতের পরিচ্ছদধারী ভবিষ্যদ্বক্তারা, অগুনতি স্থান পেয়েছে এখানে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ, এমনি জ্বলন্ত শিখার অন্তরালে পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার আক্রোশের মধ্যে নরকের বৃষমস্তক প্রহরীদের দ্বারা শাস্তি ভোগ করছিল, আর যে যেদিকে পারছিল দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য

হয়ে পালাচ্ছিল, বাতাসের ঝাপটায় শরতের ঝরাপাতার মতো। আপাতদৃষ্টিতে মেয়েগুলোকে মনে হচ্ছিল চৈত্রের কলাপাতার মতো, চুলগুলো দ্বিধাবিভক্ত আর আটকানো, পেশিগুলো মাকড়সার পায়ের মতো টেনে বাঁধা। পা উপরের দিকে, মাথা নিচু ঝুলে-থাকা মানুষগুলোকে দেখতে স্পষ্টতই প্রাদেশিক গভর্নরের মতো, হৃৎপিণ্ডটায় বিঁধে আছে তপ্ত বল্লম। কাউকে পেটানো হচ্ছে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে, কাউকে নিষ্পেষিত করা হচ্ছে জীবন্ত পাথরের তলায়। হিংস্র পাখিগুলো ঠুকরে মারছে কাউকে, আবার কারো কণ্ঠনালি ছিঁড়ে ফেলছে বিষাক্ত ড্রাগনে। এমনি বিভিন্ন উপায়ে নির্যাতিত হচ্ছিল অসংখ্য শ্রেণীর পাপী।

ভীতিকর এ দৃশ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল তরবারি গাছের ডগায় শূন্যে আটকানো একটা গরুর গাড়ি, এ গাছের শাখাগুলো পশুর তীক্ষ্ণ দণ্ডের মতো, আর এতে আটকে ছিল মৃত আত্মার অসংখ্য দেহ। নরকের বিস্ফোরণে ছিটকে উপরে উঠে যাচ্ছে এ গাড়ির ছৈ-টা; আর দুঃসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠছে সম্রাজ্ঞী বা রাজকুমারীর জমকালো পোশাক-পরিহিতা একজন অভিজাত মহিলা। প্রজ্বলিত শিখার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ছে তার একরাশ কালো চুল, বাঁকিয়ে উপরদিকে উঠে গেছে তার শঙ্খশ্বেত-কণ্ঠ। জ্বলন্ত নরকের এক হাজার একটি ভয়াবহ নির্যাতন-দৃশ্যের মধ্যে গরুর গাড়িতে দগ্ধীভূত যন্ত্রণাকাতর এই নারীমূর্তিটি সবচেয়ে বীভৎস। এই একটি চিত্রের মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে রকমারি দুর্ভোগের সামগ্রিক ভীষণতা। এ অসহনীয়, অপার্থিব, অপূর্ব শিল্পকীর্তি অবলোকন করার আগেই দর্শকের কানে হয়তো এসে বাজবে, শাস্তিভোগী বিপর্যস্ত আত্মাদের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ।

ঠিক এ কারণেই এ দৃশ্য অঙ্কনের ঐকান্তিক ইচ্ছাই অবতারণা করে এ ভয়ংকর ঘটনার। আর এ ঘটনাই যদি না-ঘটত, তবে য়োশিহাইদই-বা কেমন করে নরকের বিক্ষিপ্ত, ব্যথাহত দৃশ্য আঁকত। হয়তো এ চিত্র সে আঁকতে পারত, কিন্তু তার জীবনের পরিণতিও হত খুবই দুঃখজনক। সত্যি, জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী য়োশিহাইদ, নিজেই নিজের জন্য চরম শাস্তি বিধান করেছিল, শুধু এ চিত্রেরই জন্য।

আমি শঙ্কিত হয়ে পড়েছি, নরকচিত্রের এ অভাবনীয় কাহিনী হয়তো দ্রুত বলতে গিয়ে, কাহিনীর পর্যায়ক্রম হারিয়ে ফেলেছি। এখন আবার আমি ফিরে যাচ্ছি য়োশিহাইদের কাছে। মহামহিম তাকে নরকচিত্র অঙ্কনের জন্য তখন আদেশ দিয়েছেন।

৭

য়োশিহাইদ এ চিত্রের খসড়া আঁকতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখল প্রায় পাঁচ-ছয় মাস ও ক্ষণিকের জন্য। এল না রাজদর্শনে। কন্যার প্রতি অস্বাভাবিক স্নেহান্ধ

শিল্পী যখন একবার একটি চিত্র অঙ্কনে হাত দিল, সে বেমালুম ভুলে গেল মেয়ের কথা, ভাবতে সত্যি আশ্চর্য লাগে। তারই ছাত্রের কথায় বলা যায়, তাকে যেন জ্বিনে পেয়েছিল। সে-সময় জোর গুজব রটেছিল যে, সে নাকি আবার তার মান সম্মান, হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল, কারণ সে পুজো দিয়েছিল সৌভাগ্যের দেবতা, 'রেনার্দে'র।

'প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদি চাও' কেউ কেউ বলে, 'যখন সে কাজ করে লুকিয়ে দেখে এসো, দেখবে ছায়ার মতো তার চারপাশে ভিড় করে আছে শৃগাল অপদেবতারা।'

শিল্পী হাতে একবার তুলি তুলে নিলে ভুলে যেত দুনিয়ার কথা। দিনরাত বন্ধ থাকত তার স্টুডিও'র দরজা, দিনের আলোয় তাকে দেখা যেত না কখনো। নরকচিত্র আঁকার সময় তার যে মনোনিবেশ সেটা ছিল সবচাইতে অসাধারণ।

স্টুডিও'র দরজা বন্ধ করে সে মেশাত তার গোপন রংগুলো; আর তার ছাত্রদের কখনো কারুকার্যখচিত সুরম্য অথবা অতি-সাধারণ পোশাক পরিয়ে খুবই যত্নের সঙ্গে রঙের সাহায্যে পর্দায় ফুটিয়ে তুলত তাদের ছবি।

কিন্তু এ-রকম দু-একটি কার্যপদ্ধতি তার কাছে ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মতো। এতে তাকে আনতে পারেনি নরকচিত্রের পরিণতির সে চরম উন্মত্ত অবস্থায়। একবার পাঁচটি স্তরে আত্মার ক্রমবিবর্তন আঁকার সময় রাজপথে তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায় গলিত শবের। অন্য কোনো সাধারণ শিল্পী হলে হয়তো চলে যেত মুখটা বাঁকিয়ে, কিন্তু শিল্পী য়োশিহাইদ পূতিগন্ধময় শবের পাশে বসে নির্বিকারচিত্তে পরম একাগ্রতার সঙ্গে খসে খসে যাওয়া মুখমণ্ডলের প্রতিটি পেশির, এমনকি নগণ্য একটি চুলের ছবিও সে এঁকেছিল নিখুঁতভাবে। আমার ভয় হচ্ছে, তার একাগ্র মনোনিবেশের ছবিটি হয়তো নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে পারলাম না আমার বর্ণনায়। তবু এ অবস্থায় খুঁটিনাটি ঘটনা বিবৃত করতে পারছি না, শুধু তুলে ধরছি কয়েকটা প্রধান ঘটনা।

একদিন রং মেশাচ্ছিল তার এক শিক্ষানবিশ, সে-সময় শিল্পী হঠাৎ বলে উঠল, 'এখন আমি একটু আরাম করব। কয়েকদিন থেকে খুব বাজে স্বপ্ন দেখছি কতকগুলো।'

'সত্যি, গুরুদেব?' কাজ করতে করতেই ছেলেটি এমনি কথাটা বলল। এটা কিছুই অস্বাভাবিক নয় গুরুর ব্যাপারে।

'যাক, শোনো,' ছেলেটিকে নম্রস্বরে অনুরোধ জানাল শিল্পী, 'আমি যখন আরাম করব, আমার বিছানার পাশে একটু বোসো।'

'ঠিক আছে গুরুদেব,' জবাব দিল শিক্ষানবিশটি, যদিও তার মনে হল না-জানি এমন কী হয়েছে যার ফলে তার গুরুদেব এ দুঃস্বপ্নের জন্য চিন্তাগ্রস্ত; যা হোক, এতে যে-কোনো অসুবিধা হতে পারে, এ চিন্তা সে মনে ঠাঁই দেয়নি আদৌ।

'আমার সঙ্গে আমার ভেতরের ঘরে এসো। অন্য কোনো ছাত্র যদি আসতেও চায় তাকে আসতে দিয়ো না।' বেশ চিন্তিতভাবে ইতস্তত করে শিক্ষক বললেন। ভেতরের ঘর মানে তার স্টুডিও।

ঘরের দরজা আঁটসাঁটভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল, ঠিক প্রতিদিনের নিয়ম অনুযায়ী। ঘরে জ্বলছে খুবই মৃদু একটা বাতি, মনে হচ্ছে যেন রাত নেমে এসেছে। চিত্রের ভারী পর্দা ঝুলছে ঘরের চারপাশ দিয়ে, তার উপর কয়লা দিয়ে আঁকা হয়েছে খসড়া ছবির নকশা। ঘুমানো তার আধঘণ্টাও হয়নি হঠাৎ শিক্ষানবিশটির কানে ভেসে এল এক অদ্ভুত, অবর্ণনীয় শব্দ।

৮

প্রথমে শোনা গেল শুধু একটি স্বর। কিন্তু ডুবন্ত মানুষের মর্মান্তিক আর্তনাদের মতো ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল কতকগুলো অসংলগ্ন কথা "কি? তুমি আমাকে আসতে বলছ? ... কোথায়? কোথায় আসতে হবে ...?" কে কথা বলছে, "এসো নরকে, জ্বলন্ত নরকে।" কে সে? তাছাড়া কে হতে পারে?...'

ছেলেটি ভুলে গেল রং মেশাতে। অপাঙ্গে চেয়ে দেখল শিক্ষকের মুখের দিকে। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখমণ্ডল, আর বড় বড় ফোঁটায় চুঁইয়ে পড়ছে ঘাম। মুখটা খুলে হা হয়ে গেছে, যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিশ্বাস নেবার। শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দু-একটি দাঁত। আর মুখের মধ্যে যে-জিনিসটা এলোমেলো নড়ে বেড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে দড়ি বা তার দিয়ে বাঁধা, সেটা হচ্ছে তার জিভ। অসংলগ্ন কথাগুলো অবশ্য বের হয়ে আসছে তার মুখ দিয়ে: 'হুঁ, তুমিই। তুমিই হবে এটা আমি ধারণা করেছিলাম ... আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? ... বেশ এসো। নরকে এসো। নরকে আমার মেয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

শিক্ষানবিশটি শিউরে উঠল ভয়ে, ঠাণ্ডা একটা স্রোত বেয়ে গেল তার শিরদাঁড়া দিয়ে, যখন সে দেখল অস্পষ্ট, অদ্ভুত এক প্রেতাত্মা নেমে আসছে সেই পর্দার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত রাখল য়োশিহাইদের গায়ে আর প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি দিতে চেষ্টা করল এ দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কিন্তু তার ভূতগ্রস্ত শিক্ষক সে-অবস্থাতেই আপনমনে কথা বলে যেতে লাগল, জেগে উঠল না কিছুতেই। সুতরাং শিক্ষানবিশটি সাহস করে পাত্র থেকে পানি নিয়ে এসে ঢেলে দিল তার শিক্ষকের মুখে।

'তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করব, এসো, এই গাড়িতেই এসো... এ গাড়িটাই নরকে নিয়ে যাও।' কথাগুলো যেন বিঁধে গেছে গলায়, গোঙানির স্বরে বেরিয়ে আসতে-না-আসতেই, যেন কেউ সুঁচ ফুটিয়েছে এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠল য়োশিহাইদ। দুঃস্বপ্নের সে প্রেতাত্মাগুলো নিশ্চয় এখনো চেপে আছে ভীষণভাবে

তার চোখের পাতায়। মুখটা তখনো খোলা, মুহূর্তের জন্য চাইল শূন্যদৃষ্টিতে। তারপর স্থির হয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'যাক, ঠিক আছে, শোনো, তুমি এখন যাও।'

ছাত্রটি কোনো প্রশ্ন করলে নিশ্চয় গাল খেত নির্মমভাবে। সুতরাং সে যথাসত্বর বেরিয়ে গেল শিক্ষকের ঘর ছেড়ে। যখন সে ফিরে এল বাইরের উষ্ণ আবহাওয়ায়, নিশ্বাস ফেলল স্বস্তির, মনে হল দুঃস্বপ্নের অবসান হয়েছে তার নিজেরই।

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ এটাই ছিল না। মাসখানেক পরে স্টুডিওতে ডাক পড়ল আরেকজন শিক্ষানবিশের। তুলি কামড়াতে কামড়াতে য়োশিহাইদ বলল, 'আমার আদেশ, সব কাপড়চোপড় খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যাও।' শিক্ষানবিশটি সঙ্গে সঙ্গে কাপড়চোপড় খুলে ফেলল সব, যেহেতু শিল্পী এ-ধরনের আদেশ করেছেন একবারই।

'আমি সত্যি খুবই দুঃখিত, আমি কাউকে কোনোদিন শেকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখিনি, কিন্তু তোমাকে যা বলব, তা করব মাত্র একটিবারের জন্যই। য়োশিহাইদের স্বর বরফশীতল, দুঃখের নামলেশহীন, মুখের এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি। সুগঠিত তনুর অধিকারী তরুণ শিক্ষানবিশটির দিকে চেয়ে মনে হয় তার হাতে তুলির চেয়ে তরবারির অনায়াস চালনা বেশি সম্ভব। সে কল্পনাতীত আশ্চর্য হয়ে তার শিক্ষকের কথার পুনরুক্তি করে বারবার বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে, গুরুদেব হয়তো পাগল হয়ে গেছেন, আর এ-জন্যই তিনি আমাকে খুন করতে চান।'

য়োশিহাইদ অধৈর্য হয়ে উঠল তার ইতস্তত ভাব লক্ষ করে। কোথা থেকে শেকল বের করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পিঠের উপর এবং ভীষণভাবে হাতদুটো পেছনদিকে মুচড়ে দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে, আচমকা এমন এক টান দিল যে সে টানে মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল শিক্ষানবিশটি এবং আটকা পড়ে গেল শেকলের দুঃসহ বাঁধনে।

৯

শিক্ষানবিশটিকে দেখে এসময়ে মনে হচ্ছিল যেন কাত হয়ে পড়া একটা মদের পিপে। তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো এমনভাবে দুমড়ে-মুচড়ে গেছিল যে একমাত্র মাথা ছাড়া আর কিছুই নড়াবার ক্ষমতা তার ছিল না। শেকলের বাঁধনের চাপে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিবর্ণ, নীল হয়ে গেছিল গায়ের, মুখের, বুকের এবং শরীরের অন্যান্য অংশগুলো। অবশ্য তার এ যন্ত্রণার দিকে ভ্রুক্ষেপও করল না য়োশিহাইদ, বরং তার শৃঙ্খলিত দেহের পাশে বসে এঁকে ফেলল অনেকগুলো চিত্র। এমন কঠিন বাঁধনে যে তার কী কষ্ট হচ্ছিল, তা বলাই বাহুল্য!

কোনো অঘটন না ঘটলে হয়তো তার এ যন্ত্রণাভোগের বিন্দুমাত্র উপশম হত না। সৌভাগ্যবশত—ঠিকমতো বলতে গেলে দুর্ভাগ্যবশতই—কিছুক্ষণ পরে, কী

যেন লতানো জিনিস বেয়ে উঠল শিক্ষানবিশটির ঠিক নাকের উপর, আর তখনই সে শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'সাপ! সাপ!'

তার শরীরের সব রক্ত যেন মুহূর্তে জমে বরফ হয়ে যাবে মনে হয়েছিল, এ-কথাই আমাকে বলেছিল শিক্ষানবিশটি। গলায় ঠিক যেখানে শেকলটা কেটে বসেছে, ঠিক সেখানে ছোবল দিতে উদ্যত হয়েছিল সাপটা। ধীরমস্তিষ্ক য়োশিহাইদও বুঝি হতভম্ব হয়ে গেছিল অভাবনীয় ঘটনায়। তুলিটা চট করে ফেলে দিয়ে, নিচু হয়ে, লেজ ধরে একটান দিয়ে ফেলে দেয় সাপটাকে। বাধা পেয়ে সাপটা মাথা তুলে নিজেরই চারপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে, কিন্তু সে য়োশিহাইদের হাতের কাছে পৌছাতে পারল না, এটাই তার দুঃখ।

'জাহান্নামে যা, হতচ্ছাড়া সাপ! তোর জন্য সুন্দর একটা টান আমার নষ্ট হয়ে গেল।' নিষ্ফল আক্রোশে সাপটাকে য়োশিহাইদ ফেলে দিল ঘরের কোণায় একটা কলসিতে। তারপর অনিচ্ছাকৃতভাবে শেকলের বাঁধনটা খুলে দিল শিক্ষানবিশটির শরীর থেকে। বাঁধনটাই সে খুলে দিল শুধু, কিন্তু তার বদলে এতটুকু দুঃখ, সমবেদনা অথবা ক্ষমাভিক্ষাও করল না। শিক্ষানবিশটিকে সাপে কামড়ানোর চেয়ে তার ঐ তুলির টানের অসফলতা তার কাছে অনেক বেশি দুঃখের।

এ-সব কাহিনী শুনলে আপনারা সহজেই সুন্দর একটা ধারণা করতে পারবেন, য়োশিহাইদের ক্রূর, উন্মাদ মনোনিবেশের! সবশেষে আমি আর-একটা কাহিনী বলব আর এতে দেখবেন এই নরকচিত্র আঁকার সময় প্রায় জীবন নিয়ে কী মারাত্মক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল একটা তেরো-চৌদ্দ বছরের শিক্ষানবিশ। ছেলেটার মুখের আদলটা ছিল মেয়েলি, গায়ের রং ছিল ফরসা। এক রাতে য়োশিহাইদের ঘরে তার ডাক পড়লে ঢুকে প্রদীপের আলোয় দেখে, হাতের তালুতে কাঁচা মাংস রেখে অদ্ভুত এক পাখিকে খাওয়াচ্ছে তার শিক্ষক। পাখিটার আকার অনেকটা বিড়ালের সমান, চোখদুটো ভাঁটার মতো গোল এবং বড় বড়, রং হলুদ, মাথার দু'পাশ দিয়ে পাক খেয়ে নেমে এসেছে কোঁকড়ানো চুলের রাশ, আর দেখতে মনে হচ্ছে আস্ত একটা ভুতুড়ে বেড়ালের মতো।

১০

স্বভাবগতভাবেই তার কোনো কাজে নাকগলানো পছন্দ করত না য়োশিহাইদ। তার পরিকল্পনা কী সেটা সে তার শিক্ষানবিশকে জানতে দিতে নারাজ, যেমন সাপের ব্যাপারটা কেউ জানে না কী তার ইচ্ছে ছিল। তার দেরাজে দেখা যেত কোনো সময় মানুষের মাথা, আবার কোনো সময় রুপোলি পানপাত্র অথবা সোনালি পানপাত্র। তার আঁকার বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে বিস্ময়কর

জিনিসগুলো সাজানোর রকমফের হত। কোথায় সে এগুলো রাখত কেউ খুঁজে পেত না। তবে একটা মজা হয়েছিল, এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে-সময় জোর গুজব রটেছিল যে পরম ক্ষমতাশালী সৌভাগ্যের দেবতার দ্বারা সে রক্ষিত। সুতরাং অদ্ভুত সেই জীবটিকে দেখে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষানবিশটির মনে হল যে এটাও নিশ্চয় নরকচিত্র অঙ্কনের কোনো মডেল, তাই সে জিজ্ঞেস করল, 'কী আদেশ গুরুদেব?' মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল শিক্ষাগুরুকে।

'দেখ, কী রকম শান্ত জীব!' চিত্রকর বলল। লাল ঠোঁটদুটো চেটে নিল জিভ দিয়ে, মনে হল যেন শুনতেই পায়নি প্রশ্নটা।

'জন্তুটার নাম কী, গুরুদেব? এরকম আগে কোনোদিন দেখিনি।' এ-কথা বলে ভূত দেখার মতো নাক-কান বুজে শিক্ষানবিশটি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেই অদ্ভুত জন্তুটির দিকে।

'কী বললে? এরকম দেখোনি কোনোদিন? শহুরে লোকগুলোকে নিয়ে ওখানেই তো অসুবিধা। অথচ জানা উচিত তাদেরই বেশি। এ পাখিটাকে বলা হয় শিঙে-পেঁচা। কয়েকদিন আগে এটা আমাকে দিয়েছে 'কুরামার' এক শিকারি। এটুকু বেশ নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, এর মতো পোষমানা জীব দ্বিতীয়টা আর নেই।'

এ-কথা বলেই, সে ধীরে হাতটা উঠিয়ে মৃদু আঘাত করল পেঁচাটার পিঠের পালকে, পেঁচাটার খাওয়া শেষ হয়েছিল তখনই। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র তীক্ষ্ণ এক ভয়ংকর শব্দ করে পাখিটা উড়ে উঠল দেরাজ থেকে, আর পায়ের প্রসারিত ধারালো নখ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিক্ষানবিশটির উপরে। মুহূর্তে হাত উঠিয়ে মুখটা না ঢাকলে ছেলেটা আহত হত ভীষণভাবে। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠে পাগলের মতো তাড়াতে লাগল পেঁচাকে। কিন্তু বিরাট পাখিটা, তাকে আঁচড়ে ঠুকরে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল তার অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে। ছেলেটা তার শিক্ষকের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে, পাগলের মতো দৌড়াতে লাগল ঘরের চারপাশে, কখনো দাঁড়িয়ে রক্ষা করে নিজেকে, আবার কখনো বসে পড়ে চেষ্টা করে তাড়াতে। পাখিটা তাকে অনুসরণ করতে লাগল ছায়ার মতো, আর অসতর্ক মুহূর্তে উপড়ে নিতে চাইল তার চোখদুটো। রহস্যময় এক পরিবেশের সৃষ্টি করল পাখার ভয়ংকর আন্দোলন, কখনো ভেসে এল ঝরাপাতার গন্ধ, কখনো প্রপাতের জলকণার সুরভি, আবার হয়তো শাখামৃগ-মদের টকটক গন্ধ। শিক্ষানবিশটির নিজেকে এতই অসহায় মনে হল যে, আবছা বাতির আলোটা যেন কুহেলিকাময় চাঁদনিরাত আর তার শিক্ষাগুরুর ঘরটা যেন দূর পাহাড়ের অন্তরালে অবস্থিত কোনো-এক জনহীন সুপ্তিমগ্ন ভৌতিক উপত্যকা।

যা হোক, পেঁচাটার আক্রমণই তাকে ভীতিবিহ্বল করে তোলেনি শুধু, বিপন্ন হতাশায় হৃদয়টা তার স্তব্ধ হওয়ার পেছনে ছিল য়োশিহাইদের উদাসীন চেহারা। এই

অবসরে নির্বিকারচিত্তে কাগজ পেতে, ভয়ংকর এ দৃশ্য এবং বিষণ্ন আর্তনাদ নিরীক্ষণ করে পরম নিশ্চিন্তে এঁকে যাচ্ছে একের-পর-এক ছবি। এ কাজ যেন তার খুবই সহজ। আর সেই শয়তান-পাখিটার আক্রমণে সেই মেয়েলি চেহারার ছেলেটার আকৃতি হয়ে উঠেছে যন্ত্রণাকাতর, বিকৃত। হতভাগা ছেলেটা একপলক দেখেই যখন বুঝতে পারল গুরু তার কী করছে, তার সারাশরীরে বয়ে গেল মৃত্যুভয়ের শিহরণ এবং তাকে যে মেরে ফেলা হচ্ছে এটা অনুভব করতে লাগল প্রতিমুহূর্তে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথাই বলা যায় যে, তাকে মেরে ফেলার ইচ্ছাই হয়তো ছিল তার শিক্ষকের, তা না হলে স্থিরমস্তিষ্কে তার অদ্ভুত পরিকল্পনা সিদ্ধির জন্য সুন্দর একটা ছেলেকে সে রাত্রে ডেকে শিঙে-পেঁচাটা লেলিয়ে দেবে কেন? আর নির্বিকারচিত্তে আত্মরক্ষা-উন্মুখ ভীতসন্ত্রস্ত ছেলেটির চিত্রই-বা আঁকবে কেন? সুতরাং যে-মুহূর্তে বুঝতে পারল তার শিক্ষকের অভিসন্ধি, কেন জানি ঢেকে ফেলল দু'হাত দিয়ে তার মুখটা। কিছুক্ষণ পরেই অমানুষিক তীব্র চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল ঘরের কোণায় দরজার পাশেই। কী যেন হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল ঠিক সেই মুহূর্তেই। তারপর হঠাৎ আগের চেয়েও ভয়ংকর হয়ে উঠল শিঙে-পেঁচার পাখার ঝটপটানি, আর যেন ভয়ে চিৎকার করে উঠল য়োশিহাইদ। তখন কী হয়েছে দেখার জন্য মাথা তুলল ভয়ে বুদ্ধি-হারানো ছেলেটা। ঘর তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, আর একজন শিক্ষানবিশকে ডাকার জন্য শিক্ষকের উত্তেজিত স্বর কানে এসে বাজল সেই অন্ধকারের মধ্যে।

বহু ডাকের পর একজন প্রত্যুত্তর করল অনেকদূর থেকে, কিছুক্ষণ পর সে বাতিহাতে ঢুকল। বাতির আলোয় দেখা গেল বাতিদান উল্টে পড়ে গেছে, আর মেঝের মাদুরের উপরটা হয়ে গেছে একটা তেলের পুকুর, অদূরে একটা মাত্র পাখা ঝাপটাচ্ছে আর যন্ত্রণায় ছটফট করছে শিঙে-পেঁচাটা। য়োশিহাইদ বেশ সঙ্গত কারণে অর্ধোত্থিত হয়ে এমন এক অনুচ্চস্বরে বিড়বিড় করে উঠল যা মানুষের বোধগম্যের বাইরে। পেঁচাটার একটা পাখাসহ গলাটা শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরেছে কালো একটা সাপ। ভীষণ লড়াই আরম্ভ হয়েছে, মনে হয় ছেলেটার ধাক্কা লেগে যখন উল্টে যায় কলসিটা; বেরিয়ে আসে সাপটা আর পেঁচাটা তখনই ঠোকরাতে চেষ্টা করে সাপটাকে। শিক্ষানবিশ দু'জন নিমেষে দৃষ্টিবিনিময় করে, আর বিস্ময়ে মুখ হা করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে এই আশ্চর্য লড়াই, তারপর নত হয়ে গুরুদেবকে অভিবাদন করে বেরিয়ে যায়। পরে সাপটার এবং পেঁচাটার কী হয়েছিল কেউ জানে না।

এমনি বহু উদাহরণ আছে। আমি আগেই বলেছি, শীতের প্রারম্ভে মহামহিম যখন শিল্পীকে আদেশ করেছিলেন নরকচিত্র অঙ্কনের জন্য, এগুলো ঘটেছিল ঠিক তখনই। তখন থেকে শীতের শেষপর্যন্ত সবক'টা শিক্ষানবিশ তাদের গুরুদেবের

এহেন অদ্ভুত ব্যবহারের জন্য সদাশঙ্কিত ছিল বিপদের ভয়ে। শীতের শেষে নরকের দৃশ্য আঁকার কাজে কতকগুলো বিরাট বাধার সম্মুখীন হল য়োশিহাইদ। চেহারা আগের চেয়ে কেমন যেন ম্লান, বিষণ্ন মনে হল, কথাবার্তা হয়ে উঠল কর্কশ। যে-কাজের আশিভাগ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, সে-কাজের বাকিটুকুর খসড়া আঁকাও তার হয়ে ওঠে না। ভাবে-ভঙ্গিতে সে এত বেশি অতৃপ্ত, ক্লান্তিময়, স্বস্তিহীন যে তার খসড়া চিত্রগুলো মুছে ফেলতেও তার বুঝি কোনো দ্বিধা বা সংকোচ হবে না।

এ চিত্রের কোথায় যে কোন্ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হল কেউ বলতে পারবে না। সাহসও করল না কেউ খুঁজে বের করতে। যেসব শিক্ষানবিশ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছিল বা বুঝেছিল সবকিছু, তারা যথাসাধ্য দূরে দূরে থাকতে লাগল গুরুদেবের কাছ থেকে, অবশ্য তারা এটাও জানত যে, এ-ও অনেকখানি বাঘ ও নেকড়ের সঙ্গে একই খাঁচায় থেকে লুকোচুরি খেলা।

১২

অতএব উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা আর ঘটেনি কয়েকদিনের মধ্যে। সবচেয়ে লক্ষণীয় হল একগুঁয়ে য়োশিহাইদের পরিবর্তন, কেমন করে যেন অদ্ভুত ভাবপ্রবণ হয়ে উঠল বৃদ্ধ, যার জন্য ধারেকাছে কেউ না থাকলে বসে বসে কাঁদত। একদিন কোনো একজন শিক্ষানবিশ বাগানে গিয়ে দেখে অশ্রুসজল দৃষ্টি মেলে দিয়ে বসে আছে তার গুরুদেব, আকাশের বুকে বসন্ত-বিদায়ের লক্ষণ তখন সুস্পষ্ট। গুরুদেবের চেয়েও বেশি অপ্রতিভ এবং লজ্জিত হয়ে নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে পালিয়ে এল ছেলেটি। পর্দায় আঁকার জন্য উপযুক্ত দৃশ্য পায়নি বলে যে পাষাণহৃদয় মানুষটি রাস্তার ধারে মৃতদেহকে মডেল হিসেবে নিয়ে ছবি এঁকেছিল, সে-ই আজ কাঁদছে ছোট্ট শিশুর মতো, এটা আশ্চর্য লাগে না?

য়োশিহাইদ যখন ছবি আঁকার কাজে নানাভাবে সম্পূর্ণ মগ্ন, তখন তার মেয়ে, যে-কোনো কারণেই হোক, এত বেশি বিষণ্ন হয়ে উঠেছিল যে তাকে দেখলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হত যে জলভারে বিপর্যস্ত মেঘের মতো সে দু'চোখের অশ্রু রোধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মেয়েটি ছিল নম্র, উজ্জ্বলবর্ণা এবং নিখুঁত আকৃতির। ফলে ভারী পল্লবের নিচে অশ্রুভারানত চোখদুটো দেখলে তাকে মনে হত বড্ড নিঃসঙ্গ এবং বেদনাতুর। নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলেছিল প্রথম প্রথম, যেমন 'বাবা-মাকে হারিয়ে মেয়েটা চিন্তা করছে', 'মেয়েটা বিরহকাতর' ইত্যাদি। যাহোক, জোর গুজব রটেছিল যে, মহামহিম মেয়েটার ওপর শক্তিপ্রয়োগের চেষ্টা করেছিল তার কামনা নিবৃত্তির জন্য। এর পর থেকেই তারা মেয়েটি সম্পর্কে সব আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিল, যেন তারা ভুলে গেছে সেই মেয়েটিকে।

ঠিকই এই সময়ে একদিন গভীর রাতে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম একা, হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল বানর য়োশিহাইদ। তারপর কাকুতি-মিনতি করে টানতে লাগল জামার কোণা ধরে। স্মরণ যদি আমার সত্যি হয় তবে বলব, সে রাত ছিল স্বচ্ছ, সুন্দর আর উজ্জল চাঁদের আলোয় ভরা, বনকুসুমের গন্ধে ভরা ছিল মৃদুমন্দ বাতাস। বানরটা পাগলের মতো ভীষণ চেঁচামেচি করছিল আর চাঁদের আলোয় দেখতে পাচ্ছিলাম তার চকচকে দাঁতগুলো, নাকের উপরের খাঁজ। আমি রেগেছিলাম সত্তর ভাগ আর হতভম্ব হয়েছিলাম ত্রিশ ভাগ। প্রথমে ভেবেছিলাম লাথি দিয়ে সরিয়ে চলে যাই। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল সামুরাইটির কথা, বানরটাকে গাল দিয়ে সে বেচারা অপ্রীতিভাজন হয়েছিল রাজকুমারের। যাহোক, বানরটার ব্যবহারে মনে হল অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। সুতরাং সে যেদিকে টেনে নিয়ে চলল, সেদিকে কয়েকশো গজ হেঁটে চললাম উদ্দেশ্যহীনভাবে।

বারান্দাটা ঘুরে এসে পৌঁছলাম অপর প্রান্তে, চোখের সামনে ভেসে উঠল নিখুঁত ছাঁটাইকরা পাইনশাখার ফাঁক দিয়ে রাতের ঝলসে-ওঠা স্বচ্ছ পুকুরের অপরূপ বিশাল বিস্তার। তখন খুব কাছের একটা ঘর থেকে কানে এসে বাজল সন্দেহজনক এক ধস্তাধস্তির শব্দ। চারিদিকে শ্মশানের নীরবতা, আলো-আঁধারিতে অস্পষ্ট সবকিছু মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মাছের ঘাঁই মারার শব্দ। আপন প্রবৃত্তি অনুসারেই থামলাম, তারপর পা টিপে এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে, আর যদি সত্যি দুষ্কৃতিকারী হয় তবে কয়েক ঘা দেবার জন্য প্রস্তুত করে নিলাম নিজেকে।

১৩

আমার কাজকামে নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে উঠেছিল বানর য়োশিহাইদ। গলায় তার কেউ যেন ছুরি বিঁধিয়ে দিয়েছে এমনি করুণভাবে কেঁদে কেঁদে কয়েকবার চক্কর দিল আমার পায়ের গোড়ায়, তারপর লাফ দিয়ে উঠে গেল ঘাড়ের উপর। নখের খোঁচা খেয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মাথাটা ঘুরিয়ে নিলাম তাকে ফেলে দেওয়ার জন্য, কিন্তু সে আমার জামার হাতা আঁকড়ে ধরল যেন সে পড়ে না যায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই অনিচ্ছাকৃতভাবেই পিছিয়ে পড়লাম কয়েক পা, তারপর কষে ধাক্কা দিলাম দরজায়। ইতস্তত করার এতটুকু সময় ছিল না তখন। হুট করে দরজা খুলেই ঢোকার উপক্রম করলাম, চাঁদের আলোর আওতার বাইরে সে ঘরের অন্ধকারে। আঁতকে উঠলাম ভয়ে, চোখদুটো আটকে গেল যুবতীর দিকে চেয়ে, সে যেন স্প্রিং-এ আটকানো এভাবে ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দুরন্ত বেগে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সে যেন আমার উপর আছড়ে পড়বে মনে হল। কিন্তু না, সে সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। রুদ্ধশ্বাস

তার, বলতে পারব না কেন। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে ভয়ে, তখনও যেন তার চোখের সামনে ভাসছে ভীতিকর কোনো বস্তু।

আপনাদের বলার জন্য খুব বেশি কষ্ট অবশ্য আমার করবার দরকার নেই—এ আর কেউ নয়, য়োশিহাইদের কন্যা। কিন্তু সে-রাতে তাকে এতই সুন্দরী মনে হয়েছিল যে তার ছায়া চিরদিনের মতো স্পষ্ট ছাপ রেখে গেল আমার চোখের ওপর, তাকে সম্পূর্ণ আলাদা কেউ মনে হয়েছিল সে-রাতে। উজ্জ্বল চকচক করছে চোখদুটো, কপালে ফুটে উঠেছে গোলাপি আভা। বিস্রস্ত বেশবাস ও অন্তর্বাস তার প্রস্ফুটিত যৌবন এবং অপরূপ কমনীয়তাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল শতগুণ, তাকে মনে হচ্ছিল সংসারের সবকিছুর ঊর্ধ্বে অপূর্ব এক রমণীমূর্তি। এ কি চিত্রকরের সেই নম্র, শান্ত মেয়েটি? দরজায় হেলান দিয়ে, চাঁদের আলোয় দেখতে লাগলাম যৌবনবতী নারীকে। তারপর হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম অন্ধকারে দ্রুত পদক্ষেপ শুনতে পেয়ে, আর শব্দকারীকে তীরবিদ্ধ করে ফেলতে পারি এভাবে বললাম, 'কে তুমি?'

মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে নীরবে মাথা নাড়ল শুধু। মনে হল খুবই মর্মাহত।

এজন্য মাথাটা নিচু করে, তার কানের কাছে মুখ নিয়ে শ্রুতিগোচর স্বরে জিজ্ঞেস করলাম: 'কে ছিল?' কিন্তু সে তবু মাথাই নাড়ল, জবাব দিল না। অশ্রুসিক্ত দুটি চোখের পল্লব, আরো জোরে কামড়ে ধরল দুটো ঠোঁট।

দিনের মতো যা পরিষ্কার তা-ও বুঝতে পারি না, আমার জন্মগত বেকুবির জন্য। সুতরাং কী বলবে বুঝতে না পেরে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম স্থাণুর মতো, ভাবখানা এমন যেন মেয়েটির বুকের ধুকধুকানি আমি শুনতে চাই। আর তাকে কীই-বা শুধাব এটাও খুঁজে পেলাম না।

জানি না কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে, সেভাবেই। যাহোক, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে তাকালাম মেয়েটির দিকে। তার উত্তেজনা তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে অনেকখানি। সে তখন সামলে নিয়েছে নিজেকে, যতখানি সম্ভব নরমস্বরে বললাম, 'যাও, এখন ঘরে যাও।'

যা আমার দেখা উচিত নয় তাই দেখে মনে মনে অনুভব করতে লাগলাম অস্বস্তিকর তীব্র এক জ্বালা, আর লজ্জা পেলাম খুবই। তাকে তো আমি চিনি না বা জানি না—তারপর যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানেই ফিরে চললাম। দশধাপও যাইনি হঠাৎ কে যেন টান দিল আমার পোশাকের প্রান্ত ধরে। ফিরে চাইলাম আশ্চর্য হয়ে। ভাবুন তো কে হতে পারে?

আর কেউ নয়, বানর য়োশিহাইদ। মানুষের মতো মাটিতে হাত রেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অভিবাদন করতে লাগল বারবার মাথা নুইয়ে আর তার গলায় বাজতে লাগল সোনার ঘণ্টা: টুং টাং, টুং টাং।

১৪

সপ্তাহ দুয়েক পর, রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করল চিত্রকর য়োশিহাইদ। সম্রাটের সাক্ষাৎ পাওয়া এমনিতে খুবই দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু তিনি দেখা করতে চাইলেন সানন্দে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাজির করার আদেশ দিলেন। যদিও চিত্রকর অতি নগণ্য স্তরের একটি মানুষ, তবু হয়তো মহামহিমের বিশেষ কোনো অনুগ্রহ ছিল তার জন্য। চিত্রকরের পরিধানে যথারীতি সেই পীতবর্ণের পোশাক, মাথায় নরম টুপি। যথেষ্ট মর্যাদাসহকারে নিজেকে উপস্থিত করল সম্রাটের সামনে, চোখের দৃষ্টি তার আগের চেয়েও বিষণ্ন। ধীরে ধীরে মাথা উঠিয়ে, তার সহজাত মোটা কর্কশস্বরে বলে উঠল:

'হুজুরের পরম অনুগ্রহ, পর্দায় নরকের চিত্র অঙ্কনের জন্য যে আদেশ হুজুর পূর্বে করেছিলেন, দিনরাত সে-কাজে নিজেকে আমি নিয়োজিত রেখেছি, এবং সমাপ্তির কাছে প্রায় পৌঁছে গেছি।'

'অভিনন্দন নাও আমার! শুনে খুশি হলাম।' কিন্তু আস্থার যেন যথেষ্ট অভাব দেখা গেল মহামহিমের কণ্ঠস্বরে।

'জ্বি না, হুজুর। অভিনন্দন হুকুমের শামিল নয়।' স্বরটা নিচু করে বলল য়োশিহাইদ, অসন্তোষ যেন গুমরে উঠল সে স্বরে। 'এটা প্রায়ই শেষ করে এনেছি কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই আঁকতে পারছি না।'

'কী বললে! তুমি আঁকতে পারো না, এমন জিনিসও আছে?

'জি, হ্যাঁ, হুজুর। এটাই নিয়ম, সবকিছুই আমি আঁকতে পারি না, শুধু যা দেখি তাই আঁকতে পারি। তাছাড়া যত চেষ্টাই আমি করি-না কেন, যেটা পরম পরিতৃপ্তিসহকারে আঁকতে পারি না, সেটা আমার আঁকতে না-পারারই শামিল।'

'ও, তাহলে তুমি এখন আঁকবে নরক, তার মানে সেটা তুমি নিজের চোখেই দেখতে চাও, তাই না?' সম্রাটের মুখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল বিদ্রূপের একটুকরো হাসি।

'হুজুর, যথার্থ বলেছেন। কয়েক বছর আগে, যখন বিরাট এক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল এখানে, তখন নিজের চোখে দেখেছিলাম জ্বলন্ত নরকের উদ্যত আগুনের শিখা। এজন্যই আঁকতে পেরেছিলাম পাক-খাওয়া শিখার দেবতার ছবি। মহামান্য হুজুরও সে-ছবি আমার দেখেছেন।'

'দুষ্কৃতিকারীদের খবর কী? কোনো কয়েদি দেখেনি তো এখনো, দেখেছ নাকি?' য়োশিহাইদ কী বলছে না-বলছে কর্ণপাত না করে মহামহিম প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন একের-পর-এক।

'লোহার শেকলে বাঁধা মানুষকে আমি দেখেছি। হিংস্র পাখিদের আক্রমণে জর্জরিত মানুষের ধারাবাহিক ছবি আমি এঁকেছি। কী করে বলব আমি,

সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী অথবা কয়েদিদের আমি দেখিনি...?' বলে য়োশিহাইদ হাসল একটু বেকুবের মতো। 'ঘুমে অথবা জাগরণে তারা প্রায়ই হাজির হয়েছে আমার চোখের সামনে। প্রতিটি দিনরাত ভিড় করে দাঁড়িয়েছে বৃষমস্তক দৈত্য, অশ্বমস্তক দৈত্য অথবা ত্রিমস্তক ষষ্ঠ-হস্ত দৈত্য, হাততালি দিয়ে নিঃশব্দে, হাঁ করে তাড়া করে এসেছে নিঃস্বর মুখে, ভয় দেখিয়েছে। তাদের আঁকার জন্য অত ভাবনা আমার নেই।'

সম্রাট হয়তো ভীষণ আশ্চর্য হয়েছিলেন য়োশিহাইদের কথায়। ক্ষণিকের জন্য য়োশিহাইদের মুখে তাঁর নিষ্পলক উত্তেজিত দৃষ্টি ফেলে খেঁকিয়ে উঠলেন সম্রাট, 'তাহলে কী আঁকতে পারছ না তুমি?' ভ্রু কুঁচকে চেয়ে রইলেন বিরক্তিভরে।

১৫

'ঠিক পর্দার মাঝখানে, মহাশূন্য থেকে ছিটকে পড়ছে একটা অভিজাতের জমকালো গাড়ি, কী করে আঁকব এটা, সে-কথাই ভাবছি', বলল য়োশিহাইদ আর এই প্রথম সম্রাটের মুখের দিকে চাইল পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে।

একবার শুনেছিলাম, লোকটা যখন ছবির কথা বলতে থাকে তখন যেন পাগল হয়ে যায়। যখন সে কথা বলছিল, নিশ্চয় তার দৃষ্টির মধ্যে যেন ফুটে উঠেছিল ভয়ংকর কোনো রূপ।

'হুজুর হুকুম দিলে গাড়িটা কেমন হবে জানাতে পারতাম', বলল চিত্রকর। 'এ গাড়িতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে থাকবে একজন অপূর্ব সুন্দরী অভিজাত মহিলা। তার পিঠের উপর দিয়ে এলিয়ে পড়বে কালো চুলের রাশ এবং ছটফট করবে যন্ত্রণায়। তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসবে কালো ধোঁয়ায়, ভ্রুদুটো যাবে কুঁচকে, মুখটা তার উঠে থাকবে গাড়ির ছাদের দিকে। দলে দলে ভয়ংকর সব পাখি উড়ে বেড়াবে গাড়ির চারপাশে আর ঠোকর দেবে... ওহো, কিন্তু জ্বলন্ত গাড়িতে অভিজাত মহিলার এ ছবি আমি আঁকব কেমন করে?'

'হুঁ... আর কী?' আশ্চর্য ব্যাপার, মহামহিম যেন বেশ আগ্রহসহকারেই শুনছেন। এভাবেই বলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন য়োশিহাইদকে।

'হায়, এ আমি আঁকতে পারব না', ক্লান্তস্বরে আবার বলল য়োশিহাইদ, তার অসুস্থ লাল ঠোঁটদুটো তখন কাঁপছে। কিন্তু তার ধরন হঠাৎ বদলে গেল পরম আগ্রহ নিয়ে, যথেষ্ট সাহস, শক্তি এবং বলিষ্ঠ স্বরে, মরিয়া হয়ে অনুনয় করে উঠল, 'হুজুর, দয়া করে একজন অভিজাতের গাড়ি আমার সামনে পোড়ানো হোক আর যদি সম্ভব হয়...।'

ক্ষণিকের জন্য রহস্যময় হয়ে উঠল সম্রাটের মুখমণ্ডল, তারপর হেসে উঠলেন প্রচণ্ড স্বরে।

'তোমার ইচ্ছাই পূরণ করা হবে', ঘোষণা করলেন সম্রাট, হাসিতে কণ্ঠ তার তখনো রুদ্ধ। হওয়া সম্ভব কিনা, এটা অহেতুক জিজ্ঞেস কোরো না।'

তাঁর কথায় আমার বুকের ভেতর কেঁপে উঠল ভয়ে। এটা ভুল ধারণাও হতে পারে আমার। যাহোক, মহামহিমের ব্যবহার সেদিন সত্যিই কেমন যেন অমানবিক মনে হয়েছিল, হয়তো য়োশিহাইদের পাগলামি তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। মুখের দু'কষে জমে উঠেছিল ফেনা আর ভীষণভাবে নামছিল ভ্রুদুটো।

'হ্যাঁ, একজন অভিজাতের গাড়িই আমি পোড়াব।' তিনি থামলেন, আবার ফেটে পড়লেন বিরতিহীন হাসিতে। 'সে গাড়িতে অভিজাত মহিলার পোশাকে সজ্জিত হয়ে থাকবে অপূর্ব সুন্দর একটি মেয়ে। সে ছটফট করবে ভয়ংকর সেই আগুনের শিখা ও কালো ধোঁয়ার মধ্যে, গাড়ির মধ্যেই মহিলাটি নিঃশেষ হয়ে যাবে যন্ত্রণায়। তোমার ছবির জন্য বর্ণনা দেওয়া এত সুন্দর একটা মডেল এবং তাকে খুঁজে পাওয়ার ফলে সারাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পী হয়ে উঠবে তুমি। প্রশংসা করছি তোমার। সর্বান্তঃকরণে প্রশংসা করছি তোমার।'

সম্রাটের এ কথায় পাংশুবর্ণ হয়ে গেল য়োশিহাইদ। মিনিটখানেক বোধহয় আপ্রাণ চেষ্টা করল ঠোঁটদুটো নাড়াবার, তারপর চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় মেঝের মাদুরে হাত রেখে নম্রস্বরে বলল, 'অসীম কৃতজ্ঞ আমি হুজুর', এত নিচুস্বরে বলল যে প্রায় শোনাই যায় না।

সম্রাটের কথায় এ রকম হওয়ার কারণ আমার মনে হয়, তার পরিকল্পনার বীভৎস রূপ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল তার মনে। জীবনে শুধু এই একবারই আমার বড্ড করুণ এবং অসহায় মনে হয়েছিল য়োশিহাইদকে।

১৬

কয়েকদিন পর একরাতে স্বচক্ষে একজন অভিজাত ব্যক্তির গাড়ি-পোড়ানোর দৃশ্য দেখার জন্য মহামহিম ডেকে পাঠালেন য়োশিহাইদকে। অবশ্য এ দৃশ্য মহামহিমের হরকাওয়া প্রাসাদের সামনের মাঠে সংঘটিত হয়নি। এটা পোড়ানো হয়েছিল পাহাড়ি এলাকার য়ুজ (বরফের স্তূপ) প্রাসাদে, এখানে তাঁর বোন এককালে থাকতেন।

বহুদিন থেকে জনবসতিহীন হয়ে পড়েছিল এ প্রাসাদ এবং বিস্তৃত বাগানটা প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছিল। সে-আমলে সম্রাটের মৃত বোন সম্পর্কে অহেতুক গুজব রটেছিল অনেক। কেউ কেউ বলত, অমাবস্যার রাতে রক্তিম রহস্যময় পোশাক পরে আজো তিনি ঘুরে বেড়ান বারান্দা দিয়ে অথচ পা তাঁর মাটিতে ঠেকে না। সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত এ প্রাসাদ যারা দেখেছে, নিঃসন্দেহে তাদের অলীক কল্পনাপ্রসূত এগুলো। কিন্তু এতে আশ্চর্য হওয়ার ছিল না কিছুই, কেননা দিনের বেলাতেও খুবই স্তব্ধ এবং নির্জন ছিল

তার চারপাশ। সন্ধ্যা নেমে এলে বাগানের মধ্যে দিয়ে বয়ে-যাওয়া জলধারার কুলকুল ধ্বনি কেমন গা-ছমছম করা পরিবেশ সৃষ্টি করত আর রাতে বকগুলো উড়লে তারার আলোয় ভয়ংকর সব পাখির মতোই মনে হত।

সে-রাতটা ছিল চাঁদহীন ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝাড়বাতির আলোয় দেখা যাচ্ছিল, বারান্দায় বসে আছেন মহামহিম, পরনে তাঁর উজ্জ্বল সবুজ রঙের পোশাক এবং জামাটা গাঢ় বেগুনি রঙের। সাদা সুতোর কারুকাজ-করা মাদুরের উপর পা আড়াআড়ি রেখে বসেছিলেন। তাঁর সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে প্রায় পাঁচ-ছ'জন সামুরাই মর্যাদাসহকারে নিযুক্ত ছিল প্রহরায়। এদের মধ্যে একজন সামনেই দাঁড়িয়েছিল বেশ নজরে পড়ার মতো। কয়েক বছর আগে, তোহোকু জেলায় অভিযানের সময় খিদের জ্বালা মেটানোর জন্য এ লোকটাই চিবিয়ে খেয়েছিল মানুষের মাংস। তার ফলে সে এমনি এক অমানুষিক শক্তির অধিকারী হয়েছে যে ইচ্ছে করলে জীবন্ত একটা হরিণের শিং উপড়ে ফেলতে পারে। বর্মাচ্ছাদিত হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল বারান্দার নিচে পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে, আর তার খাপে-ঢাকা তলোয়ারটার মাথা ছিল উপরদিকে। অস্বাভাবিক ভয়ংকর এ দৃশ্যের মাঝে আলোগুলো কখনো উজ্জ্বল আবার কখনো নিবু নিবু হয়ে আসছে বাতাসে। এ অবস্থায় আশ্চর্য হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, জেগে আছি না ঘুমিয়ে গেছি।

পরমুহূর্তেই রাজকীয় ঐতিহ্য নিয়ে জমকালো একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাগানের অন্ধকারে, লম্বা লম্বা বল্লম আটকানো তার পাশে, সোনালি কাজ-করা গাড়িটা যেন ঝলসে উঠল তারার মতো, কিন্তু আমরা কেঁপে উঠলাম শীতে, তখন যদিও বসন্তকাল। গাড়ির ভেতরটা ভারী নীল পর্দা দিয়ে ঢাকা আর সুন্দর ঝালর দেওয়া, সুতরাং গাড়ির ভেতরে কী আছে আমরা বুঝতে পারলাম না। জ্বলন্ত মশাল হাতে গাড়ির চারদিকে অনেকগুলো চাকর দাঁড়িয়ে, মশালের ধোঁয়া বাতাসের বারান্দার দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বলে, তারা একটি ভাবনায় পড়ে গেছিল।

বারান্দার নিচে সম্রাটের সামনে হাঁটু গেড়ে অপেক্ষা করছিল য়োশিহাইদ। ঈষৎ পীতাভ রঙের তার পোশাক, মাথায় সেই নরম টুপি। তাকে যেন অনেক ক্ষুদ্র এবং আন্তরিকতাপূর্ণ মনে হচ্ছিল, যদিও তাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তারাভরা আকাশের ক্ষুব্ধ পরিবেশ। তার ঠিক পেছনে যে-লোকটি ছিল, তারও পরনে একই পোশাক, দেখে মনে হয় তার শিক্ষানবিশ। আলো থেকে একটু দূরে ছিল ওরা, যার জন্য স্পষ্ট ধরা যাচ্ছিল না পোশাকের রঙটা।

১৭

তখন প্রায় নিশুতি রাত। চারদিক ঢেকে গেছে আঁধারে। নদী অথবা কুঞ্জবীথি চোখে পড়ছে না কিছুই, ওরা বোধহয় নীরবে শুনছে এখানকার মানুষগুলোর

নিশ্বাসের শব্দ। ঠিক তখনই মৃদু বাতাস বয়ে এল আমাদের দিকে আর সাথে ভেসে এল মশালের কটু গন্ধ। এ অদ্ভুত দৃশ্য নীরবে অবলোকন করছিলেন সম্রাট, তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন এবং তীক্ষ্ণস্বরে ডাকলেন, 'য়োশিহাইদ'।

মনে হল য়োশিহাইদ জবাবে কিছু বলতে চায়, কিন্তু কানে আমার ভেসে এল শুধু একটা আর্তনাদ।

'তুমি চেয়েছিলে তাই আজ রাতে আমি গাড়িটাতে আগুন লাগাচ্ছি', বললেন মহামহিম, আর জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাইলেন পার্শ্বচরদের দিকে। তারপর দেখলাম অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন দেহরক্ষীদের দিকে। কিন্তু এটা হয়তো আমার অলীক কল্পনাও হতে পারে। মনে হল য়োশিহাইদ ভক্তিভরে মাথা তুলল, কিন্তু বলল না কিছুই।

'ঐ দেখো! ঐ সেই গাড়ি যেটাতে সাধারণত আমি নিজেই চড়ে বেড়াই। এ গাড়িটা তো তুমি চেনো য়োশিহাইদ, তাই না? এখন তোমারই ইচ্ছানুসারে, তোমারই চোখের সামনে এতে আগুন লাগাচ্ছি আমি, আর পৃথিবীর বুকে জীবন দান করছি এক জ্বলন্ত নরকের।'

সম্রাট থামলেন। আবার ইঙ্গিতবহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন প্রহরীদের দিকে, তারপর বলতে লাগলেন বিরক্তিভরে :

'একজন নারী অপরাধী শেকল দিয়ে বাঁধা আছে গাড়িতে । এতে যদি আগুন লাগিয়ে দেওয়া যায়, আমি নিশ্চিত যে শরীরের মাংসগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে, পুড়ে কালো হয়ে যাবে হাড়গুলো আর তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে ঢলে পড়বে মরণের কোলে। তোমার ছবি সমাপ্তির জন্য এর চেয়ে ভালো মডেল আর পাবে না। বরফের মতো শুভ্রত্বক তার কীভাবে পুড়ে কালো হয়ে যাবে, দেখতে ভুলে যেয়ো না। ভালোভাবে লক্ষ কোরো, আগুনের হলকায় কেমনভাবে নাচছে তার কালো চুলের রাশ।'

তৃতীয়বারের জন্য মুখ বন্ধ করলেন সম্রাট। আমি জানি না কী উদয় হয়েছিল তাঁর মনে। নীরব হাসিতে ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, 'উত্তরপুরুষদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে এ দৃশ্য। এখানে বসে আমিও অবশ্য দেখব। পর্দা উঠিয়ে ভেতরের মেয়েটাকে দেখাও য়োশিহাইদকে।'

তাঁর হুকুমে একজন প্রহরী এগিয়ে গেল গাড়ির কাছে, তারপর হাত বাড়িয়ে ঝট করে উঠিয়ে দিল পর্দাটা। দাউদাউ করে নেচে উঠল মশালের রক্তিম আলো, আর তার তীব্র উজ্জ্বলতায় ছোট্ট ভেতরটা হঠাৎ আলোয় ভরে গেল, দেখা গেল আসনের উপর শেকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একটা নারী। আহা, তাকে চিনতে ভুল হবে কার? যদিও পরনে তার রেশমি বুটিদার রাজকীয় কিমোনো, নকশা-কাটা চেরিফুলের; ঝুলে পড়েছে মাথাটা আর ঝলমল করে উঠল আলোয় চুলে-আটকানো সোনার কাঁটাগুলো, মেয়েটির গড়ন ছিপছিপে, সুন্দর কৌমার্যের

মাধুর্যমণ্ডিত নম্র দেহলতা— এগুলোই তো সন্দেহের অতীত প্রমাণ যে সে য়োশিহাইদেরই কন্যা। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম।

সেই মুহূর্তে তরবারির বাঁটে হাত রেখে উঠে দাঁড়াল আমার সামনের সামুরাইটি এবং তীব্র একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল য়োশিহাইদের দিকে। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে দেখি যে, বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছে য়োশিহাইদ। যদিও সে বসেছিল হাঁটু গেড়ে, লাফ দিয়ে উঠে হাতদুটো বাড়িয়ে, জ্ঞানশূন্যভাবে ছুটে যেতে চাইল গাড়ির দিকে।

যাহোক, আঁধারের আড়ালে থাকায় আমি লক্ষ করতে পারছিলাম না তার মুখের ভাব। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের অবসর। রাতের মৃদু আলোয় সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, মুখটা তার কাগজের মতো শাদা হয়ে গেছে আর তাকে যেন শূন্যে তুলে ধরেছে কোনো-এক অদৃশ্য শক্তি। সে-মুহূর্তে মহামহিমের নির্দেশ শোনা গেল, 'জ্বালাও আগুন', আর একঝাঁক মশালের তীব্র আলোর জোয়ারে ভরে উঠল গাড়িটি, তারপর উত্থিত হল দাউদাউ আগুনের স্তম্ভ।

১৮

মুহূর্তমধ্যে গাড়ির ছৈ ঘিরে ফেলল আগুনে, চোখের পলকে, দমকা বাতাসে আকাশে উড়ে গেল ছাদের রঙিন ঢাকনা; পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ারাশি পাক খেয়ে উঠল অন্ধকার আকাশে; আগুনের ফুলকিগুলো শূন্যের মধ্যে এত জোরেই লাফাতে লাগল যে বাঁশের বেড়া, ঝালর, ছাদের ধাতব কড়াগুলো আগুনের গোলার মতো উৎক্ষিপ্ত হল আকাশে। জ্বলন্ত আগুনের উজ্জ্বল লেলিহান জিহ্বা স্পর্শ করতে চাইল আকাশের বুক, মনে হল স্বর্গ থেকে যে পবিত্র আগুন একদিন নিক্ষিপ্ত হয়েছিল পৃথিবীতে, তাই আবার ফিরে যেতে চাইছে। একটু আগেই যে-আমি প্রায় চিৎকার করে উঠছিলাম, সে-আমিই এখন নির্বাক, নিস্তব্ধ, হতভম্ব হয়ে মুখ হা করে নিঃসাড়ে দেখতে লাগলাম ভয়ংকর আগুনের বীভৎস লীলা। কিন্তু বাবা য়োশিহাইদের পক্ষে ...

চিত্রকর য়োশিহাইদ কীভাবে চেয়ে ছিল এখনো আমি মনে করতে পারি। প্রাণের মায়া না করে সে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল গাড়ির কাছে। কিন্তু যে-মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, সে থেমে গেল, মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাতদুটো বাড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; জ্বলন্ত আগুনের শিখা এবং কালো ধোঁয়ার রাশি অতিক্রম করে যেন প্রবেশ করতে চাইল তার তীব্র, তীক্ষ্ণ, নিষ্পলক দৃষ্টি। আলোর বন্যায় যে সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছিল এখন, বলিরেখাময় কুঞ্চিত মুখ পরিষ্কার চোখে পড়ে, এমনকি প্রতিটি দাড়ির চিহ্ন পর্যন্ত।

সম্পূর্ণ আয়ত দুটি চোখ, বাঁকা ঠোঁট, বারবার কেঁপে-ওঠা তোবড়ানো গাল সবকিছুই তার মনে একই সঙ্গে ভিড় করে আসা ভয়, হতাশা আর বিহ্বলতার স্পষ্ট বাহ্যিক প্রকাশ। শিরশ্ছেদের আদেশ পাওয়া ডাকাত অথবা বিচারের জন্য

ইয়ামার সামনে টেনে নিয়ে যাওয়া কোনো জঘন্য অপরাধীর চেহারাও এত করুণ বা যন্ত্রণাকাতর হয় না। তার দিকে লক্ষ করে আসুরিক শক্তির অধিকারী সামুরাইটি পর্যন্ত বেদনাহত হয়ে চেয়েছিল সম্রাটের মুখের দিকে।

মহামহিম দাঁতে দাঁত কামড়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন গাড়ির দিকে, আর মাঝে মাঝেই আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। তবু গাড়ির মধ্যে যে-মেয়েটি আমারই সামনে তিলে তিলে দগ্ধীভূত হচ্ছিল, তার হুবহু বর্ণনা দেব কোন্ সাহসে বা কোন্ ক্ষমতায়। তার সুন্দর কমনীয় মুখটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে হেলে গেছিল পেছনে, খুলে এলিয়ে পড়েছিল মেঘের মতো কালো চুল, আগুনকে শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য ঝাঁকি দেওয়ার সময়, মুহূর্তে আগুনের রঙে লাল হয়ে গেছিল, তার জমকালো, সুন্দর, চেরি ফুলের নকশাকাটা কিমোনো—কী মর্মান্তিক দৃশ্য! রাতের দমকা বাতাসে ধোঁয়াটা যখন ধীরে ধীরে বয়ে গেল, অন্যদিকে উদ্যত আগুনের শিখায় ফুলকিগুলো শূন্যে লাফিয়ে উঠতে লাগল স্বর্ণরেণুর মতো। যন্ত্রণাকাতর খিঁচুনির সঙ্গে সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। মনে হল, তাকে বেঁধে রাখা শিকলগুলোও হয়তো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। এসব ছাড়াও, নরকের বীভৎস নির্যাতনের দৃশ্য, আমাদেরই চোখের সামনে, তিক্ত বাস্তবের এমন এক ভয়ংকর রূপ নিল যে—উপস্থিত জনতা, এমনকি সামুরাইগুলোরও মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল রক্ত-হিম-করা শীতল স্রোত আর ভয়ে খাড়া হয়ে উঠল সবক'টা চুল।

আবার আমাদের মনে হল, নিশীথ রাতের বাতাস ব্যথায় গুমরে উঠল গাছের মাথায়। বাতাসের শব্দ অন্ধকার আকাশে মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই—কী জানি তখনো ছিল হয়তো কালো একটা বস্তু, না-উড়ে না-মাটি ছুঁয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রাসাদের ছাদ থেকে, সেই নিদারুণ আগুনের শিখার মাঝে। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে-পড়া জ্বলন্ত সোনালি-রক্তিম বেড়ার মাঝে, কালো ধোঁয়ার পর্দার আড়ালে, সে দগ্ধীভূত মেয়েটির ঘাড়ে হাত রাখল আর দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী ব্যথাদীর্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল, তারপর আবার, আবার, আবার শোনা গেল এমনি দুঃসহ অমানুষিক চিৎকার।

কী জানি আমরাও সবাই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম একসঙ্গে। জ্বলন্ত আগুনের রক্তিম পটভূমিকায় মৃতা মেয়েটির ঘাড় অত শক্ত করে ধরেছে কে? সে আর কেউ নয়, হরকাওয়া প্রাসাদের য়োশিহাইদ নামে ডাকা সেই নগণ্য বানরটা।

১৯

কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ড ছিল বানরটা আমাদের চোখের সামনে। তখনই লক্ষ লক্ষ উল্কার মতো আগুনের ফুলকি লাফিয়ে উঠল রাতের বাতাসে, কালো ধোঁয়ার ঘূর্ণিপাকের গহনে তলিয়ে গেল মেয়েটা বানরটার সঙ্গে। তারপর বাগানে দাউদাউ

আগুনে গাড়ি পোড়ার ভীষণ শব্দ ছাড়া আর দেখা গেল না কিছুই। তারাভরা আকাশের দিকে লাফিয়ে ওঠা বিক্ষুব্ধ বিশ্রস্ত এই আগুনের শিখাকে বিশাল স্তম্ভের সঙ্গে তুলনা করলে বুঝি সবচেয়ে অর্থবহ হত।

আগুনের এ স্তম্ভের সামনে, জড়বৎ দাঁড়িয়ে শুধু য়োশিহাইদ। কী আশ্চর্য পরিবর্তন! তার মুখের বলিরেখায় ফুটে উঠেছে এক অপূর্ব সৌম্য, শান্ত, রহস্যময় জ্যোতি; কয়েক মূহূর্ত আগে এ মুখই নরকযন্ত্রণার দৃশ্যে কদর্য হয়ে উঠেছিল তীব্র যাতনায়। সম্রাটের উপস্থিতি তার স্মরণে নেই, এমনভাবে বুকের উপর হাতদুটো তার শক্ত করে আড়াআড়িভাবে বাঁধা। মেয়ের যন্ত্রণাকাতর মরণের ছায়ার কোনো প্রতিফলনই ছিল না তার চোখে। আগুনের রমণীয় রঙে, দু'চোখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল অপূর্ব আনন্দে, আর সেই নারীমূর্তি তখন দহনজ্বালায় ছটফট করে উঠল শেষবারের মতো।

পরম আদরের কন্যার মরণযন্ত্রণা নিরীক্ষণ করেও যে সৌম্য প্রশান্তি এবং জ্যোতির্ময় সৌন্দর্য তার মধ্যে ফুটে উঠল তা সত্যি অপরিসীম বিস্ময়কর। মানুষের কল্পনায় তুলনাহীন এক অপরূপ মর্যাদা ফুটে উঠল য়োশিহাইদের মধ্যে। এ মর্যাদা যেন স্বপ্নের মধ্যে দেখা পশুরাজ সিংহের প্রতিহিংসার বিকাশ। এটা আমাদের কল্পনাও হতে পারে হয়তো। কিন্তু চেয়ে চেয়ে দেখলাম, অভাবনীয় আগুনের ভয়ে কিচিরমিচির করে দলে দলে উড়ে পালাচ্ছিল যেসব রাতের পাখিরা, য়োশিহাইদের নরম টুপিটি দেখে তারাও যেন উড়তে লজ্জা পেল। তার মাথার উপরে যেন ফুটে বেরুলো এর অপূর্ব জ্যোতি আর তার রহস্যময় মর্যাদার প্রতি সম্ভ্রম দেখিয়ে, হৃদয়ের নামলেশহীন পাখিরাও বুঝি সংকুচিত হয়ে এল দ্বিধায়।

পাখিগুলোকে তেমনিই মনে হল। কমবেশি আমরাও কেঁপে উঠলাম। ভেতর ভেতর, আমরা নিবিড়ভাবে লক্ষ করছিলাম য়োশিহাইদকে। নতুন বুদ্ধমূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা আর ভক্তিতে আপ্লুত হয় হৃদয়, তেমনি বেদনা ও ভক্তিতে প্রত্যক্ষ করলাম তার নির্বাক মূর্তি। প্রচণ্ড শব্দে চারিদিকে তখন ছড়িয়ে পড়েছে জ্বলন্ত গাড়ির আগুন এবং ধোঁয়া। নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে য়োশিহাইদ। এ দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্য অনাবিল এক আনন্দ, বেদনা এবং করুণার সঞ্চার হল আমাদের সন্ত্রস্ত অন্তরে। যাহোক, এ দৃশ্যের বীভৎসতায় আঘাত পেয়ে এমন বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেলেন সম্রাট—যেন অন্য কোনো মানুষ। ফেনা জমল মুখের দু'কষে, খাবি খেতে লাগলেন পিপাসার্ত পশুর মতো, দু'হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলেন হাঁটুর কাছে পোশাকটা।

২০

দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল গাড়ি-পোড়ার খবর, কে যে আরম্ভ করেছিল ভবিতব্যই জানে। মানুষের মনে স্বভাবতই জাগবে প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন: কী এমন হয়েছিল

যার জন্য সম্রাট জীবন্ত দগ্ধ করলেন য়োশিহাইদের মেয়েকে। নানারকম অনুমান করা হল এর কারণ হিসেবে। সম্রাটের হতাশ প্রেমের প্রতিহিংসা চরিতার্থই যে এর একমাত্র কারণ, এ গুজব অভ্রান্ত বলে মেনে নিল অধিকাংশ লোকই। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল, য়োশিহাইদের বিকৃতি দূর করা এবং তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া, কেননা সে একান্তভাবে সুসজ্জিত জমকালো একটা গাড়ি পুড়িয়ে এবং একটি মানুষের আত্মত্যাগের প্রতিদানে আঁকতে চেয়েছিল তার ছবি। এ কথাই শুনেছিলাম মহামহিমের নিজের কাছ থেকে।

নিজের মেয়ের পুড়ে মারা যাওয়ার মুহূর্ত থেকে, তার শিল্পের জন্য পিতৃপ্রেম বিসর্জন দেওয়ায় এবং ছবিটি এঁকে ফেলার জন্য আগ্রহী হওয়ায়, অনেকেই মানুষরূপী শয়তান নামে অভিহিত করল য়োশিহাইদকে। এর সবচেয়ে বড় উদ্যোক্তা ছিল য়োকাওয়ার পুরোহিত, তিনি প্রায়ই বলতেন, কনফুসিয়াস বর্ণিত এই পাঁচটা গুণ—দয়া, বিচার, ভদ্রতা, জ্ঞান এবং প্রীতি যদি না থাকে, তবে কোনো মানুষ জ্ঞান অথবা শিল্পের যে-কোনো শাখায় যতই পারদর্শী হোক না কেন, সে নরকে যাবেই।

মাসখানেক পর, নরকচিত্র আঁকা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদে সেটা নিয়ে এসে, যথারীতি সম্মানের সঙ্গে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করল য়োশিহাইদ। পুরোহিত তখন উপস্থিত ছিলেন সেখানে, এবং প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন রূঢ়ভাবে এবং রাগত দৃষ্টিতে। যাহোক, যখন ধীরে ধীরে খোলা হল পর্দাটা, প্রধান পুরোহিত নিশ্চয়ই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিলেন ভয়ংকর আগুনের জীবন্ত রূপরেখা দেখে, সে আগুনের ঝড় যেন স্বর্গের প্রান্ত থেকে নরকের অন্তস্তল পর্যন্ত প্রসারিত।

'অপূর্ব!' আপনমনে হাঁটু চাপড়ে, নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে উঠলেন মাননীয় প্রধান পুরোহিত। তাঁর আনন্দ-উচ্ছ্বাস, কেমন করে বিষণ্ন, ম্লান একফোঁটা হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল সম্রাটের ঠোঁটের কোণে, সে-কথা আজো মনে পড়ে।

তারপর থেকে খুব কম লোকেই, বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের কেউ, চিত্রকর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করত, অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, যারা চরম ঘৃণা করত য়োশিহাইদকে তারাও পর্দায় আঁকা জ্বলন্ত নরকের বিস্ময়কর রূপ ও নির্মম নির্যাতনের বীভৎস বাস্তবতা দেখে বিমুগ্ধ হয়ে উঠত।

যাহোক, ততদিনে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে য়োশিহাইদ।

যেদিন ছবিটি আঁকা শেষ হয়, সেদিন রাতে কড়িকাঠে দড়ি ঝুলিয়ে নিজেও ঝুলে পড়ে। তার পরম আদরের কন্যা যুজুকির অকালমৃত্যুর পর বেঁচে থাকার আর কোনো সার্থকতা খুঁজে পায়নি য়োশিহাইদ।

তারই বাড়ির ধ্বংসস্তূপের একপাশে সমাধিস্থ করা হয় তাকে। বছরের-পর-বছর পার হয়ে গেছে, কত শীত বর্ষার আনাগোনা শেষ হয়েছে, ক্ষয় হয়ে গেছে সমাধি-শিয়রে পাষাণফলক, আর সবার অগোচরে ব্যথাদীর্ণ একটি হৃদয়ের সব চিহ্ন মুছে দিয়ে গেছে সবুজ শেওলার আস্তরণ।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র